ভূমিকা

১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত মাসিক-পত্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে থাকে। এই প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ বাংলা উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতে আরম্ভ হইয়া চৈত্র সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। সে যুগের বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কিরূপ ছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র "পত্র সূচনা"তেই তাহার পরিচয় আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

> যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে, যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক।...
>
> ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন২ নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়।—'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৭৯, পৃ. ১-২।

এই লজ্জাকর অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। প্রতিবিধানের প্রধান অস্ত্ররূপে তিনি 'বিষবৃক্ষ'কে ব্যবহার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে তিনখানি বাংলা উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক-রোমান্সধর্ম্মী; প্রথম যৌবনের যুক্তিহীন চপলতা এবং রঙীন স্বপ্নদর্শন সেগুলিতে বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সম্ভবতঃ সন্দেহ জাগিয়াছিল "ইংরাজীপ্রিয় কৃতবিদ্যগণ" ও "সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানী"রা ঐ উপন্যাসত্রয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হন নাই। সুতরাং তিনি ধীর স্থির ভাবে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর বাংলা দেশের সে যুগের সমাজ-জীবনের দুইটি গুরুতর সমস্যা লইয়া 'বঙ্গদর্শনে' বাঙালী সমাজের এই বাস্তব চিত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে সমস্যা বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ। 'বিষবৃক্ষে'র ইহাই

গোড়াপত্তন। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রার্থিত ফল ফলিয়াছিল। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার প্রতি দীর্ঘ দিনের অবহেলা বিস্মৃত হইয়া এই অপূর্ব্ব চমকপ্রদ কাহিনীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এক 'বিষবৃক্ষে'র দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের মনের গোপন উদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইল। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, সমসাময়িক সমালোচনায় তাহার পরিচয় আছে। 'ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' পত্রের সমালোচক লিখিয়াছিলেন—

> সমগ্র গত বৎসর ধরিয়া এই উপন্যাসখানি প্রত্যেক বাঙালীবাবুর বৈঠকখানায় বিরাজমান দেখা যাইত।*

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্চে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।—'প্রবাসী', ১৩৩৮, আশ্বিন, পৃ. ৮০৬-৭।

১২৮০ বঙ্গাব্দে [১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা জুন] 'বিষবৃক্ষ' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২১৩। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

> বিষবৃক্ষ। / উপন্যাস। / শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। / কাঁটালপাড়া। / বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ১২৮০। /

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত পাঠের সহিত প্রথম সংস্করণের পুস্তকের পাঠের বিশেষ পার্থক্য নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে বিষবৃক্ষের আটটি সংস্করণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত ইহার সামান্যই পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রথম ও শেষ (অষ্টম) সংস্করণের পাঠ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

* "This novel...was to be found in the *baitakhana* of every Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors. While the others were all historical, "men and women as they are, and life as it is," is the motto of the present one."—*The Calcutta Review*, No. CXIV, Critical Notices, p. v-vi.

দ্বিতীয় সংস্করণ কাঁটালপাড়া হইতেই ১২৮২ বঙ্গাব্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২১৪। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলির প্রকাশ-কাল ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা এইরূপ : তৃতীয়—১৮৮০, ২১২ ; চতুর্থ—১২৮৮, ২১২ ; ষষ্ঠ—১৮৮৭, ২৪৯ ; সপ্তম—১৮৯০, ২৪৯, এবং অষ্টম—১৮৯২, ২৪৮। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তক আমরা দেখি নাই।

'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হইলে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও 'সোম-প্রকাশে' পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহার বিষয়-বস্তু ও রচনারীতির উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেন, এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল সমালোচকই 'বিষবৃক্ষে'র ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'বিষবৃক্ষ' লইয়া সেকালের এবং একালের সাময়িক-পত্রে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীগুলিতে এবং বিভিন্ন সমালোচনা-গ্রন্থে বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। বহু সমালোচক কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখীর চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন ; অনেকে হীরা ও নগেন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ কমলমণি ও সূর্য্যমুখীর সম্পর্ক-বিচার করিয়াছেন। এগুলির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বসুর 'কাব্য-সুন্দরী' ও 'সাহিত্য-চিন্তা' ; মহেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সাহিত্য ও সমাজ' ; শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী ; হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম' ; ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাব্যসুধা' ; অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ; রমেশচন্দ্র দত্তের *The Literature of Bengal* এবং আর. ডব্লু. ফ্রেজারের *A Literary History of India* প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে' এবং 'সাধনা' ও 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গে" কিছু কিছু কৌতুককর খবর আছে। 'বিষবৃক্ষে'র নৈতিকতা লইয়া ইঁহারা স্বয়ং বঙ্কিমের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্র প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যান। 'আমার জীবনে'র দ্বিতীয় ভাগে (পৃ. ৩৬৬) এই সাক্ষাতের বিবরণ আছে। তন্মধ্যে 'বিষবৃক্ষ'-প্রসঙ্গ এইটুকু—

> ...তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয় বাবু [অক্ষয়চন্দ্র সরকার] আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'বিষবৃক্ষ'। তিনি—"কোন্ স্থান পড়িব ?" আমি—"যে স্থান আপনার অভিরুচি।" তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতি-প্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে

চাও ত পড়ি।" আমাকে অক্ষয় বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিম বাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতের বিবরণীতে 'বিষবৃক্ষ'-প্রসঙ্গ একটু আছে। প্রেমের কাহিনী অবাধ প্রচারের দ্বারা তিনি দেশের অহিত করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের এই অভিযোগ শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীর-গাত্রে বিলম্বিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার অয়েল-পেন্টিঙের দিকে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়াছিল। "এই কন্যাটিও কুন্দনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল।" *

'সাধনা'য় (শ্রাবণ, ১৩০১) প্রকাশিত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে 'বিষবৃক্ষে'র এই ভাবে উল্লেখ আছে—

> ...[বঙ্কিমচন্দ্র] বলিলেন, "কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা আমি স্বীকার করি।"...
>
> "প্রতিনিধি" নামক সম্বাদপত্রে আমি "কুন্দনন্দিনী" চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবু পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সামান্য চরিত্র, তার অত বিশ্লেষণের দরকার ছিল না। আমি বলিলাম, এক বিষয়ে চরিত্রটী আমার কাছে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়—উহার নিশ্চেষ্ট সরলতা। কোথাও আর অমন চিত্র দেখি নাই। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি তিলোত্তমার চরিত্রেও একটু তাহা দেখাইয়াছি।" আমি বলিলাম, কুন্দে তাহার বিকাশ অনেক বেশী।...আমার বোধ হয় যেন আপনার নাট্য স্বজন শক্তি এখন বাড়িতেছে। বঙ্কিমবাবু—"হাঁ দেখিয়াছি সে কথা সে দিন তুমি কুন্দচরিত্রের শেষে লিখিয়াছ। চন্দ্রবাবুও [চন্দ্রনাথ বসু] তাই বলেন, আমার নিজেরও তাই বোধ হয়।
>
> ...আমি বলিলাম "শুনেছি বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?" উত্তর—"কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েচে।"

শচীশচন্দ্র 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখিয়াছেন—

> হরদেব ঘোষালের পত্র দুইখানি শুনিতে পাই স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় কর্ত্তৃক লিখিত।—পৃ. ২৭৩, তৃতীয় সংস্করণ।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে Miriam S. Knight *The Poison Tree* নামে 'বিষবৃক্ষে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সার্ এডউইন আর্নল্ড ইহার ভূমিকা

---

* 'আমার জীবন'—চতুর্থ ভাগ, পৃ. ২৭৫-৭৭।

লিখিয়াছিলেন। এই ভূমিকায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ও এই উপন্যাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শচীশচন্দ্র 'বঙ্কিম-জীবনী'র (৩য় সং) ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'বিষবৃক্ষে'র অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিয়া বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট ইলিয়ট সাহেবের পত্নীকে উপহার দিয়াছিলেন। *The Bane of Life* নামে এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপির সামান্য অংশ পাওয়া গিয়াছে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্‌হল্‌ম হইতে 'বিষবৃক্ষে'র সোয়েডিশ অনুবাদ *Det giftiga Tradet* নামে প্রকাশিত হয়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সিয়ালকোট হইতে G. Quadir (Fasih) 'বিষবৃক্ষে'র হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'বিষবৃক্ষ' অভিনীত হয়।

বিষবৃক্ষ

[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত অষ্টম সংস্করণ হইতে]

কাব্যপ্রিয়

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায়

সুহৃদ্বরকে

এই গ্রন্থ

বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ

অর্পিত হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।

নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান্ ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণন করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবাপুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড়

আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। রহমত আর কখন মাঝিগিরি করে নাই—তাহার নানার খালা মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্ব্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকে ডাকে খাটো নন, নেমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভয় কি, হজুর! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" রহমত মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতি নিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয়, রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই

রহমত মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। দাঁড়ীরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সাসী ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকাসজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাহাতেই বা ক্ষতি কি?" আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে, "হজুর, পুরাতন কাছি, কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়ে, নদীতীরে ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহারও সুসাধ্য নহে। বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্ত্তী; নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল, ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘপরিপূর্ণ; সুতরাং রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

আকাশে মেঘাড়ম্বরকারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নববারি সমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুপতনশব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণশব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচনার্থ পক্ষবিধূননশব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতনশব্দ। ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুত বারি কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু কষ্টে আলোকসন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক ইষ্টকনির্ম্মিত

প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীপনির্ব্বাণ

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদলক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীটপতঙ্গাদি-সমাকীর্ণ। একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্য-জীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রী দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিন চারিখান তৈজস—ইহাই গৃহালঙ্কার। দেওয়ালে কালি, কোণে ঝুল; চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় এক জন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টকখণ্ডের উপর একটি মৃন্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থ জীবন-প্রদীপেও তাহাই। আর শয্যাপার্শ্বেও আর এক প্রদীপ ছিল,—এক অনিন্দিতগৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়রূপিণী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুই জন আশু ভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রের প্রবেশকালে কেহই তাঁহাকে দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা, এই বহুলোকপূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। এক দিন ইহাদিগের সম্পদ ছিল, লোক জন, দাস দাসী, সহায় সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্যঃসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রকন্যার মুখমণ্ডল, হিমনিষিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকতশয্যায় শয়ন করিলেন। আর সকল তারাগুলিও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা, সেও পিতৃসমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন

আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা, সেই বিজনবনবেষ্টিত ভগ্নগৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের একমাত্র উপায়। কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসার-বন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছুদিন যাক্,—কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সে দিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন। আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

এই গভীর অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিতোন্মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল; ব্যথিতপ্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা; বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়া পূর্ব্বগামিনী

নিশীথ সময়। ভগ্ন গৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা।" কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর

ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়াছিল, সেই খানে বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেন না, মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে? দিবারাত্রি জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী রাত্রি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্তহস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়নস্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে চন্দ্র নাই; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিসনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মিস্ফুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডলমধ্যশোভিনী, আলোকময়ী, কিরীট-কুণ্ডলাদি-ভূষণালঙ্কৃতা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। রমণীয় কারুণ্যপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল; স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে 'মা' কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস্। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বলপ্রজ্বলিত নক্ষত্রলোক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, "ঐ দেশ।" কুন্দ তখন যেন বহুদূরবর্ত্তী বেলাবিহীন অনন্তসাগরপারস্থবৎ, অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অত দূর যাইতে পারিব না; আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদজনিতবৎ

ভ্রুকুটি বিকাশ হইল, এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোক-প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে আকাশপ্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎ-সঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত, ললাট ; সরল, সকরুণ কটাক্ষ ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়নী যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল, এবং তৎসহিত তন্মধ্যসংবর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই সেই

নগেন্দ্র গ্রামমধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন, গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং আনুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ কেহ আসিয়া মৃতের সংকারের আয়োজন করিতে লাগিল। একজন প্রতিবেশিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল। কুন্দ যখন দেখিল যে, তাহার পিতাকে সংকারের জন্য লইয়া গেল, তখন তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবিরত রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্য্যে গেল। কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে, কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতূহলপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক শ বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

কুন্দ তখন কহিল, "আকাশ থেকে কাল মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি ভয় পাইলাম, মার সঙ্গে গেলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন গেলাম না। এখন আর যদি তিনি আসেন, আমি যাই। তাই ঘন ঘন আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছি।"

চাঁপা কহিল, "হাঁ! মরা মানুষ নাকি আবার আসিয়া থাকে?"

তখন কুন্দ স্বপ্নবৃত্তান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়ে মানুষ দেখিয়াছিলে তাহাদের চেন?"

কুন্দ। না; তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।

এদিকে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃতব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে, "উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই।" তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর। উহার বিবাহ দিও।

তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যতদিন সে তোমাদিগের বাটীতে থাকিবে, ততদিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।”

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকে তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া এক জন বলিল, “শ্যামবাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেইখানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থকন্যার উপায় হয়, এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। এবং কুন্দকে এই কথা বলিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার পর আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চাঁপা কহিল, “ও কি, দাঁড়ালি যে?”

কুন্দ অঙ্গুলিনির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, “এই সেই।”

চাঁপা কহিল, “এই কে?” কুন্দ কহিল, “যাহাকে মা কাল রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।”

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। বালিকারা অগ্রসর হইতে হইতে সঙ্কুচিতা হইল দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনেক প্রকারের কথা

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আত্মসমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন প্রথমে তাহার মেসো বিনোদ ঘোষের অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল—সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশ বাবু প্লগুর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেই খানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্যগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা মিস্ টেম্পল্ নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

কমল বড় দুষ্ট। নগেন্দ্র এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেই কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়িলেন। একটা টবে কতকটা অনতিতপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার ভিতরে ফেলিলেন। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতে হাসিতে স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ্ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন পরিচারিকা, স্বয়ং কমলকে এরূপ কাজে ব্যাপৃতা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি "আমি দিতেছি, আমি দিতেছি" বলিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল—কমল সেই তপ্ত জল ছিটাইয়া পরিচারিকার গায়ে দিলেন, পরিচারিকা পলাইল।

কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত এবং স্নাত করাইলে—কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল তাহাকে শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার

কেশরচনা করিয়া দিলেন, এবং কতকগুলি অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন, দাদাবাবুকে প্রণাম করিয়া আয়। আর দেখিস্—যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না—এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"

নগেন্দ্রনাথ, কুন্দের সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃৎ দূরদেশে বাস করিতেন—নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর কথা বলিলেন, যথা,—

"বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তভাবব্যক্তি—যদি, স্বচ্ছসরোবর শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ

করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।”

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এইরূপ—

“দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

“একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিটে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?

“তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পূরা অধিকার।

“মেয়েটিতে কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি তা ত জান। যদি একটি ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয় মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।”

তারাচরণ কে তাহা পরে প্রকাশ করিব। কিন্তু সে যেই হউক, সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন। কিন্তু মনুষ্য ত চিরান্ধ! কয়েক বৎসর পরে এমত এক দিন আইল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কুক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম! কি কুক্ষণে সূর্য্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।

এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজরা সাজাইয়া, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রাকালে একবার তাহা স্মরণপথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তারাচরণ

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না—তৎপরিবর্ত্তে স্বরচিত কাব্যগুলিন মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। এক দিন মালিনীর পুকুরে একটি অপূর্ব্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কারস্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর, কিন্তু সকলেই জানেন যে, তাহার প্রথম কবিতা কয়টি কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনী সখি! চলিলে যে!"

মালিনী বলিল, "তোমার কবিতায় রস কই?"

কবি। মালিনী! তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।

মালিনী। কেন?

কবি। স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূতকাব্য-স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে—এই নীরস কবিতাগুলিন সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিলে না—তবে লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে?

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীতা হইয়া, আদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পরদিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্রা মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবিশিরে পরাইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষযোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণীমধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রসমধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না।

সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা এক জন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতায় কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালনপালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্য্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্য্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীনবৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে ইংরেজী শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্ম্ম-কার্য্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন্ এডের প্রভাবে, গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টার বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ এক জন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি Citizen of the World এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও

বাজারে রাষ্ট ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর !" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন ? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই ; সূর্য্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায় কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের সুরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পদ্মপলাশলোচনে ! তুমি কে ?

কুন্দ, নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিল। কুন্দ, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক্ হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গোগণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত, সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ

দেড়তালা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লুটেড্ থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃন্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতালা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারি বাড়ী"। উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী"। পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পূরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারি সকল আসবাবে ভরা,—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাট-মন্দির", তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারীর দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও উর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষ-মালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও, কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া, তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও, বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে "মধো কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাটমন্দিরের

মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতা-পিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে।

এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত ; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত ; ঘর সকল অমুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়-কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁধলে না" "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেন না, তপ্ত তৈল ছিটকাইয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহ বা স্নানকালে বহু-তৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন রাখাল, পাঁচনীহস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে ; তাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদির স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি হইয়াছে—সে দারোগার মুহুরী ; গোপালে উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গালায় নাই, ইংরেজেরা না কি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ভট্টাচার্য্যিদের মেয়ের উপপতি শ্যাম

বিশ্বাস, এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচন হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্যঃপ্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না! কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে, যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশমতে "দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ" করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকারপ্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দরমহলের পর, পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে, নীলমেঘখণ্ডতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে আস্তাবল, হাতিশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনন্দিনী, বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে সূর্য্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। সূর্য্যমুখী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্রসঙ্গে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে মনে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ,

মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি, সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত লতার ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে। স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি সুন্দরী, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই—সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়্‌বিংশতি। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, কুন্দ স্বচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে প্রধানা, তাহাকে কহিলেন, যে, "এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, কুন্দের শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্ত্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী!

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ

এইখানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকাগ্রন্থের প্রথা আছে যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে যে, নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্ব্বগুণে ভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢল ঢল করিবে। গরিব তারাচরণের ত এ সকল কিছুই নাই—সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আর খাঁদা নাক—বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলেমহলে প্রকাশ—আর প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কত দূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল।

সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া, তিনি

এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যে, তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধসকল প্রায় দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ককালে মাষ্টার সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন যে, "কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল—কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচারিত হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কই হে, তুমিও কি ওল্ড্ ফুল্‌দের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদের আলাপ করিয়া দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয় পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। এইমত টালমাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া কুন্দকে নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী মেরামত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র এক দিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিল? ক্ষণকাল ঘোম্‌টা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নবযৌবনসঞ্চারের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটি বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিলেন। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া, কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, সূর্য্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভৎ‌র্সনা করিলেন যে, সেই পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসর কাল কাটিল। তাহার পর—কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

হরিদাসী বৈষ্ণবী

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছু দিন কালাতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি, সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশা বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং "উ উঁ" করিয়া উকুন মারিতেছিল, কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্যহস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদান করিয়া তিনগ্রামে সপ্তস্বরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন; কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়িতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্‌গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাশুরায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রাতে নিজ-বুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন; যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্যসম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া

আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিতা, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে!" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এই জন্য অন্তঃপুরমধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া এক জন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুরবাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ও মা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো!"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবৎ ভ্রূযুগ, নিটোল ললাট, বাহুযুগের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণীকুলদুর্ল্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন ফেরন এ সকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় টেড়ি কাটা, পরণে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিত্তলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক জন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণীরা গান শুন্‌বে?"

তখন "শুন্‌বো গো শুন্‌বো!" এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়,

বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া, সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপালে উড়ে।" যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, "গোষ্ঠ"—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দাস্‌নে দূতি।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা—তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গাইতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল, "ওগো কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো!" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু মৃদু যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নববসন্তপ্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যা-বিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল, এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্ব্বাঙ্গীণতাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান, কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল,

শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখ্‌বো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়নজলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গ্‌বো বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণনূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে।

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "গীত গাইয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও, আমি জাতি বৈষ্ণবী নহি।"

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পূর্ব্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণবী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান,

সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, বৈষ্ণবী হাত মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "তুমি নাকি গা কুন্দ ?"

কুন্দ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা ?"

বৈ। তোমার শ্বাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ ?

কু। না।

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শ্বাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।

বৈ। তোমার শ্বাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা ! হাজার হোক্ শ্বাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না ?

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল, "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শ্বাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শ্বাশুড়ী দেশছাড়া হইয়া পালাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব ; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো ; আর একটু কাঁদাকাটা করিও, নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না, কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে সেইখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, "ও একজন বৈষ্ণবী, গান করিতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসি! একটি ঠাকরুণ বিষয় গা।"

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গাইলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় লইল। সূর্য্যমুখী চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজাইয়া মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে গেল,

"আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা করে,
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে,
দিব পানের দোনা।

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, "তা হৌক, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।" তখন বামা বলিল, "রঙ্গটা বাপু বড় ফেঁকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল, "চুলগুলো যেন শণের দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল, "কপালটা একটু উঁচু।" কমলা বলিল, "ঠোঁট দুখানা পুরু।" হারাণী বলিল, "গড়নটা বড় কাট কাট।" প্রমদা বলিল, "মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত; দেখে ঘৃণা করে।" এইরূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয় কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন ললিতা বলিল, "তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।" তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, "তাই বা কি, মাগীর গলা মোটা।" মুক্তকেশী বলিল, "ঠিক বলেছ—মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল, "মাগী গান জানে না, একটাও দাশুরায়ের গান গায়িতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগীর তালবোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যার পর নাই কুৎসিতা, এমত নহে—তাহার গানও যার পর নাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ

বাবু

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহরেইলপরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠকখানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষঃ হইতে স্তনযুগল খসিল—তাহা বস্ত্রনির্ম্মিত। বৈষ্ণবী পিত্তলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানানন্তর, বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোরবয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবাপুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশসম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছে। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায় দেবীপুরের বাবুরা একবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহাদের তালুক সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা ক্ষুণ্ণধনগৌরব পুনর্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার

কোনও সুখেরই আশা নাই। বয়োগুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠানও ভার। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটূবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন—আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যান-মধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোকগমন হইয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি ভূরি সুরাভিসিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না—পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল। কিছু কাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় নূতন উপবনগৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফর্‌মর্‌ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম যুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবাবিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত—উভয়েই বলিতেন, মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর, বৈষ্ণবীবেশ ত্যাগ করিয়া, নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন। একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল; দেবেন্দ্র কিছু কাল সেই সর্ব্বশ্রমসংহারিণী তামাকুদেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদসুখভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্ব্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি

অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁক্কা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁক্কে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবক্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভর্ৎসিতজনচিত্তবিকারবিনাশিনী, প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী! মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরৌষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদভোগ করিলেন—কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চ্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণপটাবৃতা বোতলবাহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উপরে, রজতানুকৃতাসনে সান্ধ্যগগনশোভিরক্তাম্বুদতুল্যবর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড্ জুগ্ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ্চ পুরোহিত হট্ওয়াটর-প্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট্ মটন্ এবং কট্‌লেট্ নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে, দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপূরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক বাদক দল আসিল। তাহারা পূজার প্রয়োজনীয় সঙ্গীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতলকান্তি এক যুবাপুরুষ আসিয়া বসিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র; গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইঁহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইঁহাকে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র, ইঁহার ভিন্ন, সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে, সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।"

সু। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর জানিতে পারিয়াছিলে?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্ব্বমত আছে।

সু। তবে এখন এ সব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সাথের সাথী।

সু। সাথের সাথী কেন? সঙ্গে আসে নাই—সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু, বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর—"

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।

সুরেন্দ্র সজলনয়নে, মনোমধ্যে হৈমবতীকে শত শত গালাগালি দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর পত্র

"প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু।

আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও একজন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম 'ক খ" লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিনকাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?

কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে,—বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা তোমা ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে

পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাঁহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভর্ৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এতকাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন,—কেন? আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি না? আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্নবদন—এখন এত অন্যমনাঃ কেন? কথা বলিলে কথা কাণে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন 'হুঁ';—আমি যদি রাগ করিয়া বলি, "আমি শীঘ্র মরি," তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনাঃ কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মোকদ্দমার জ্বালায়।" আমি জানি, মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্যবৈধব্য অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন এক জন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন?

এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে আমি তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।

আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর, মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবাবিবাহের দিকে নয়।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, জামাই বাবুকেও এ পত্র দেখাইও না।

তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।

তোমার ছেলের সংবাদ ও জামাই বাবুর সংবাদ শীঘ্র লিখিবে। ইতি।

সূর্য্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?"

কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয়প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটি ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্য্যমুখী গৃহিণী। অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেণ্ডার পাশে এক চিক থাকিত; চিকের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন। বারেণ্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত; তাহার মুখে সূর্য্যমুখী কথা কহিতেন। এইরূপে সূর্য্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও না কেন?"

ডাক্তার। কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।

সূ। বাবু কিছু বলেন নাই?

ডা। না—কি অসুখ?

সূ। কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না—আমি জানি?

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন, বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—ঔষধ দাও।"

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে। "যে আজ্ঞা, ঔষধের ভাবনা কি," বলিয়া পলায়ন করিল। পরে ডিস্পেন্সরিতে গিয়া একটু সোডা, একটু পোর্ট ওয়াইন, একটু সিরপফেরিমিউরেটিস্, একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, শিশি পূরিয়া, টিকিট মারিয়া, প্রত্যহ দুইবার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল। সূর্য্যমুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন; নগেন্দ্র শিশি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ছুঁড়িয়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ, আমাকে বল।"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী একখানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্য্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ।

শুধু রাগ নয়। একদিন, রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত, নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিতা হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। একদিন সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটি চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন; বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাঁহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মা :ঠাকুরাণীকে বলিও—বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফস্বলের আমলারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। কর্ত্তার অমনোযোগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই।"

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

একদিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় জোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। "দোহাই হুজুর—নাএব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দাও।"

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একজন গোমস্তা একজন প্রজাকে মারিয়া একটি টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটি টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র ত পাইই না। যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাথা মুণ্ড, কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তা বল না কেন? মোকদ্দমা হারিয়াছ? তাই বা বল না কেন? আর কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ কি না বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনে করিলেন, "কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধুবিচ্ছেদ? দেবেন্দ্র দত্ত? না, এ প্রেম?"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহার শেষ এই "একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহাসমর

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন। অমনি স্বামীর কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের আয়ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া, এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরেজি সংবাদপত্রখানি অধিকার করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং করযোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ!"

(ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আবার শশা চুরি নাকি?"

ক। শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।

শ্রী। কোথায় কি চুরি হলো?

ক। গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদাবাবুর একটি সোনার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার দাদাবাবুর সোনার কৌটা ত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়িটি কি?"

ক। সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিখানি।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "তাই লোকে বলে যে, যে খেলে, সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই—" কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখ টিপিয়া ধরিলেন। ছাড়িয়া দিলে শ্রীশ বলিলেন, "তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?"

ক। তা ত জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে, সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগী এমন পত্র লিখিবে কেন?

শ্রী। পত্রখানি দেখিতে পাই ?

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হাতে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমাকে এ সকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে আহার নিদ্রা হইবে না—ঘুরণী রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না। কথাটা কি তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল।"

ক। করতে হবে এই—সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু গিয়াছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।

সতীশ বাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুলসমেত উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যাহা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম—ভাজের বাড়ী মশায়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্য্যমুখীর কাণা কড়িটি না হারালে আর এমন কথা লিখবে কেন ?"

ক। শুধু কি তাই ? সতীশের নিমন্ত্রণ ; আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রী। আমার নিমন্ত্রণ কেন ?

ক। আমি বুঝি একা যাব ? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যায় কে ?

শ্রী। এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুরজামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুরজামাই দেখিয়ে দিতে পারি।

কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রূকুটি করিল, শ্রীশকে ভেঙ্গাইল, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাই ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল, "তা লাগতে এসো কেন ?"

কমলমণি কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, "আমার খুসি, লাগবো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, "আমার খুসি, বলবো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইল।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। এখন বর্দ্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল। দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাঁহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়েরই মুখপানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিল। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার স্বুবর্ণময় পেন্‌সিল্‌টি দেখিতে পাইয়া অপহরণমানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্‌সিল্‌টি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুন প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষঃ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ, কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাদের এইরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে দণ্ডে হইত, দণ্ডে দণ্ডে যাইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, "তা সত্য সত্যই কি তোমার গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?"

ক। তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধতেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতীশে আমাতে ছু-দিকে ছুইজনে কাঁদতে বসবো।

শ্রী। আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।

ক। আয়, সতীশ! আয়, আমরা ছু-জনে ছুই দিকে কাঁদতে বসি।

মার আদরের ডাক সতীশের কাণে গেল—সতীশ অমনি পেন্‌সিলভোজন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল, স্বুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না।

তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাদুরি দেখাইয়া আর এক লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে কমল আবার কহিলেন, "এখন কি হুকুম হয় ?"

শ্রী। তুমি যাও, মানা করি না, কিন্তু তিসির মরসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই ?

শুনিয়া কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টিপ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভাল বাসি।" এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এইরূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। ফিরিবে কবে ?

ক। জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব ?

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে, সে শ্রীশ বাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজকর্ম্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। এ কথা শ্রীশচন্দ্র একদিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই ত। আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ!" কথাটা শ্রীশের কাণে গেল। তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িল

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশরচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাঁহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না!" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুইটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাথায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল কোথা থেকে?" কমল মুখ নত করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন, "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজিকে!" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমণির ঐরূপ আলাপ হইল,—"ওলো কুঁদী—কুঁদী মুদী দুঁদী—ভাল আছিস্ ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বলবি—না বলিস্ ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না, ভাই! আর দু-দিন থাক। তুমি গেলে আমি আর

বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল বলিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার কি কাজ করিবে?" কমলমণি মুখে বলিলেন, "তোমার শ্রাদ্ধ," মনে বলিলেন, "তোমার কণ্টকোদ্ধার।"

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। কুন্দনন্দিনী বালিশে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিল। চুল-বাঁধা কমলের একটা রোগ।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল। রৌদ্রের উপর বৃষ্টি হইল।

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস্ কেন?"

কুন্দ। তুমিই আমায় ভালবাস।

কম। কেন—আর কেহ কি ভালবাসে না?

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

কম। কে ভালবাসে না? গিন্নী ভালবাসে না—না? আমায় লুকুস্ নে।

কুন্দ নীরব।

কমল। দাদাবাবু ভালবাসে না?

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি—আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?" কুন্দ ঘাড় নাড়িল। "যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন, এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি?"

কুন্দ বলিল, "কি ?"

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব ? আমি তোর দিদি—আমার কাছে লুকুস্ নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।" কমল মনে মনে রাখিলেন, "যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশ বাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।"

কুন্দ বলিলেন, "কি বল ?"

ক। তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্।—না ?

কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "বুঝিছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে ?"

কুন্দনন্দিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ারমুখী চোখের মাথা খেয়েছ ? দেখিতে পাও না যে—" মুখের কথা মুখে রহিল—তখন ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, "কুন্দ !"

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

কম। আমার সঙ্গে চল।

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল, "নহিলে নয়।—সোণার সংসার ছারখার গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি ? মনে করিয়া দেখ্ ?—"

কুন্দ অনেক ক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন ? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেই জন্য অনেক ক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল ? কমল বুঝিয়াছিলেন যে, কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হীরা

এমত সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল।

"কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কাণে পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।"

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল।

"মরি মর্‌ব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?"

হরিদাসী বলিল, "কেন?" কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন, "কেন? একটা বাবলার ডাল আন ত রে—কাঁটাফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।"

সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিলেন, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না।—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।"

হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,

"স্মৃতিশাস্ত্র পড়্‌ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধোরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দে করে॥"

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "গিন্নী মশাই—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর আর স্ত্রীলোকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি মতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল; কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই—অন্যমনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেইখানে

রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এদিক্ সেদিক্ বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথাবার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল, "কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না। মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।"

সূর্য্য। মেয়ে কি পুরুষ তার ঠিক কি?

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

সূর্য্য। আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা।

"রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটো দেখাই।" এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেলেন। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—সতীশ মামীর সিন্দূরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন—এবং সিন্দূর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন—দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী, বাবলার ডাল, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে, গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া, একটু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পরিচারিকা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্র্যগ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যারা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেকগুলি পরিচারিকা কায়স্থকন্যা—হীরাও কায়স্থ। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটি সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে ব'সে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চূণ কালি দিয়া সং সাজায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি, হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্?"

হীরা। না। আমি কখন পাড়ার বাহির হই না।—আমি বৈষ্ণবী ভিখারী কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।

সূর্য্য। এ ঠাকুরবাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জান্‌তে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলিতে পারিস্, তবে তোকে নূতন বারাণসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।

নূতন বারাণসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"

সূ। তোর যখন খুসি। কিন্তু এখনও ওর পাছু পাছু না গেলে ঠিকানা পাবি না।

হীরা। আচ্ছা।

সূ। কিন্তু দেখিস্ যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।

এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসি হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে ছুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্!"

হীরা বলিল, "সব পারিব, কিন্তু শুধু বারাণসী নিব না।"

সূ। কি নিবি?

কমল বলিল, "ও একটি বর চায়। ওর একটি বিয়ে দাও।"

সূ। আচ্ছা, তাই হবে—জামাই বাবুকে মনে ধরে? বল তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।

হী। তবে দেখবো। কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটি বর আছে।

সূ। কে লো?

হী। যম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"না।"

সেই দিন প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃতা; তাহার জল অতি পরিষ্কার এবং সর্ব্বদা নীলপ্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানমধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তররচিত লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে, দুইটি বহুকালের বড় বকুল গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতকগুলি লাল ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁটাল, জাম, লেবু, লিচু, নারিকেল, কুল, বেল প্রভৃতি ফলবান্ ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড় পাখী বিকট রব করিয়া নিঃশব্দ সরোবরকে শব্দিত করিতেছিল। শীতল বায়ু, সরোবর পার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপত্রমালায় মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুল পুষ্পের গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। বকুল পুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে

অসংখ্য মল্লিকা, যুথিকা এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল। চারিদিকে, অন্ধকারে, খদ্যোতমালা স্বচ্ছ বারির উপর উঠিতেছিল, পড়িতেছিল, ফুটিতেছিল, নিবিতেছিল। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে—দুই একটা শৃগাল অন্য পশু তাড়াইবার তাহাদিগের যে শব্দ, সেই শব্দ করিতেছে—দুই একখানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে—দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ :—"ভাল সবাই আগে মলো—মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?" পিতার পরলোকযাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখনও মনে হইত না, এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল আভাসমাত্র মনে আসিল। এইমাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন, তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক ও আর ভাবি না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা। দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা হলে হব ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারি নে কি? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি নে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন—নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—ডুবেই মরি। আচ্ছা, যেন এখন ডুবিলাম—কাল ভেসে উঠবো—তবে সবাই শুনবে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র! আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি

না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভালবাসেন। কমল কি কথাটি বলতে বলতে বলিল না? সে ঐ কথাই। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য?—কিন্তু কমল জানিবে কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভালবাসেন? কিসে ভালবাসেন? কি দেখে ভালবাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি? (এই কহিয়া কালামুখী স্বচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বলিল) "দূর হউক, যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর; আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দরী। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—কই, মনে ত হয় না। কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! তা মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না; দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পারব না—পারব না—পারব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাহাদের ত সর্ব্বনাশ করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে বুঝিতে পারি। সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;—"

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন—মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমায় ঐ নক্ষত্রলোকে যাইতে বলিয়াছিলেন—আমি কেন তাঁর কথা শুনলেম না—আমি কেন গেলাম না!—আমি কেন মলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।" এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবরসোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাসম্পন্না—প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতেছিল—প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিতসঙ্কল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে কে অতি

ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর মরা হলো না।

আর নগেন্দ্র! এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র? এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা? এই কি সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি ছি! দেখ তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন। চোর সূর্য্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থহানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণহানি করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্য্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর।

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি!—চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনি!—দেখ পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

চোর বলিল, "কুন্দ! কলিকাতায় যাইবে?"

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

চোর বলিল, "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?"

ইচ্ছাপূর্ব্বক! হরি! হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

"কুন্দ—কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, "না।"

আবার নগেন্দ্র বলিলেন, "কেন, কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল, "না।"

নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, পুষ্করিণী নির্ম্মল, সুশীতল—কুসুম-বাস-সুবাসিত—পবনহিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে,—ভাবিলেন, "উহার মধ্যে শয়ন কেমন ?"

অন্তরীক্ষে যেন কুন্দ বলিতে লাগিল, "না।" বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন ? স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন ?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল। পাশে এক-দিকে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্যশৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকল-কল্লোলনিনাদিনী, আলবোলা সুন্দরী দীর্ঘ ওষ্ঠ চুম্বনার্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাথার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর একদিকে স্ফটিকপাত্রে, হেমাঙ্গী এক্‌শাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের মত, একজন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন। হুঁকা বলিতেছে, "দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি! ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!" এক্‌শাকুমারী বলিতেছে, "আগে আমায় আদর কর! দেখ, আমি কেমন রাঙ্গা! ছি ছি! আগে আমায় খাও!" প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর নাক বলিতেছে, "আমি যার, তাকে একটু দিও।"

দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন—তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। এক্‌শানন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জ্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন—নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকারীকে "গুরুমহাশয় গুরুমহাশয়" করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "আবার আজি তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কাণে গিয়াছে?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কাহাকেও লুকাইতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাইব?

সু। সেও একটা বাহাদুরী মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে গ্রামে ঢলাতে যাও?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী, দাদা? রসকলিটি দেখে, ঘুরে পড় নি ত?

সু। আমি সে পোড়ারমুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবী যাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া সুরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে দুটো কথা শুন। তার পর গিলো।"

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটাচটা দেখি—হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে নাকি?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ করবার জন্য?"

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে? সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখতে গিয়াছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্ব্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মিল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ দেবেন্দ্র, তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী যে, বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্য সহকারে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে দেবেন্দ্র গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই।

জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী-সজ্জা ধরিয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী।"

সু। তবে যাও কেন ?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি—উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কিয়ৎকাল বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূর হউক! এ সংসারে কে কার! আমিই আমার।" এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন,

"আমার নাম হীরা মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।"

তখন পারিষদেরা সকলে উঠিয়া গিয়াছিল, দেবেন্দ্র নৌকাশূন্য নদীবক্ষঃস্থিত ভেলার ন্যায় একা বসিয়া রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। রোগরূপ তিমি মকরাদি এখন জলের ভিতর লুকাইয়াছিল—এখন কেবল মন্দ পবন আর চাঁদের আলো! এমন সময়ে

জানালার দিকে কি একটা খড় খড় শব্দ হইল—কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল—হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র বোধ হয়, মনে মনে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—বলিলেন, "কে খড়খড়ি চুরি করে ?" কোন উত্তর না পাইয়া জানেলা দিয়া দেখিলেন—দেখিতে পাইলেন, এক জন স্ত্রীলোক পলায়। স্ত্রীলোক পলায় দেখিয়া দেবেন্দ্র জানেলা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা! কোন্ গাছ থেকে ?" পরে তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া একবার এক দিকে আবার আর এক দিকে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা ?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব—আজ একটু কেবল ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও," এই বলিয়া মদ্যপ স্ত্রীলোকটিকে বৈঠকখানায় বসাইয়া, মদের গেলাস তাহার হাতে দিল।

স্ত্রীলোকটা তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল।

তখন মাতাল আলোটা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল,—"তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি—কোথাও দেখেছি হে।"

তখন সে স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছি ভাবিয়া বলিল, "আমি হীরা।"

"Hurrah! Three Cheers for হীরা!" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস-হস্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিল ;—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপড়িহস্তেন সংস্থিতা ॥

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

তার পর—মালিনী মাসি।—কি মনে ক'রে?"

হীরা ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী-বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে? এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। সে গোপনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানেলার কাছে দাঁড়াইয়া দেবেন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল—ইহাতেই গোল বাধিল।

এখন হীরা পলাইবার জন্য ব্যস্ত। দেবেন্দ্র তাহার হাতে আবার মদের গেলাস দিল। হীরা বলিল, "আপনি খান।" বলিবামাত্র দেবেন্দ্র তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। সেই গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল—দুই একবার ঢুলিয়া—দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল। দেবেন্দ্র তখন ঝিম্‌কিনি মারিয়া গাইতে লাগিল;—

"বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখতে শুনতে কালো কোলো,
পিলে অগ্রমাসে মোলো,
আমি তখন খানায় পোড়ে।"

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ীতে গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল। দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দ্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না, সূর্য্যমুখীও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্যমুখী দেখিয়াছিলেন, কুন্দ বৈষ্ণবীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে—সুতরাং সূর্য্যমুখী তাহাকে দোষী মনে করিলেন। হীরার কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে শিরা স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গজন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে, "আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?"

নগেন্দ্র সাসী বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে, মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল—সেই পথে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউগাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর্ তর্ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথায় যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক—আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল—বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল। শেষে পিট্ পিট্!—পট্ পট্!—হু হু! বৃষ্টি আসিল। কুন্দ! কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথিপার্শ্বে কুন্দ একটা সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর; মৃৎপ্রাচীরের ছোট চাল। কুন্দনন্দিনী আসিয়া তাহার আশ্রয়ে, দ্বারের নিকটে বসিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কাণে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটা কুক্কুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকমাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

"কে রে মাগি?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি? কি? কি? আবার বল ত?"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এস ত।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল—হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার রাগ

হীরার বাড়ী প্রাচীর আঁটা। দুইটি ঝর্‌ঝোরে মেটে ঘর। তাহাতে আলেপনা—পদ্ম আঁকা—পাখী আঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান—এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা, কালো-চুড়ি পরা হাতখানিতে হুঁকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে।

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেইখানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলায় আয়ী যখন স্নানে যায়, হীরা তখন আসিয়া

কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিল।

"টিট্—কিট্—খিট্—খিটি—খাট্" বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজনমাত্র কখনও কখনও রাত্রে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান্, রাত ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নাড়িলে, বলে, "কট কট কটাঃ, তোর মাথা মুণ্ড উঠা! কড়্ কড়্ কড়াং! খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তা ত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটী! দেখি কেমন আমার হীরেটি! খিট্ খাট্ ছন্! উঠলো আমার হীরামন্! ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনিক্—আয় রে আমার হীরা মাণিক।" হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল; বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল —"কে ও গঙ্গাজল! এ কি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিকা স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী—একটু রৌদ্র পোড়া—মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক খাঁদা—কপালে উল্কি। কসে তামাকুপোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস্—যাহা অন্যের অসাধ্য, তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।"

হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি নাকি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস্! এখন চ।"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আমার বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকিতে এসেছে। কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশভূষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়;"

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজি সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টন্‌টনে। হীরার সঙ্গে আজ অন্য প্রকার সম্ভাষণ করিলেন। স্তবস্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরে, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।"

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পেয়েছেন। বুঝিলাম তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা একপ্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে, হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেক কাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া দুই গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গান গায়িলেন,

"এসেছিল বক্‌না গোরু পর-গোয়ালে জাব্‌না খেতে—"

বিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার দ্বেষ

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়া-প্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাহা শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া, কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্য্যমুখী রাগে বা ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া, যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না, দেবেন্দ্রের সহিত গুপ্ত প্রণয় থাকিলে, কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্য্যমুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামীর বিরাগে আরও মর্ম্মব্যথা পাইলেন। শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্রবার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—সূর্য্যমুখীকেও অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।"

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিন্তু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল—কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ করিয়া দুই প্রহরের সময়ে, আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া, কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখ-দুঃখে জাগিয়া রহিল।

সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য—অতি গোপন।

ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্য্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না।" হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোক বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভাল মানুষ হইতাম—কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।" লোকে বলে, "পাঁচ কেন সাত হইল না?" পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম—কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত—বিধাতা, অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হইলেই আমি সাত হইতাম।" হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল—"এখন কি করি? পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে যদি কুন্দকে দত্তের বাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দিবেন—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর হাতে দিই, তা হলে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরা যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন্‌মিনে ঘ্যান্‌ঘেনে, প্যান্‌পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্মফুল ফুটে না, আর কুন্দ নইলে দেবেন্দ্র বাবুর মনোহরণ হয় না! তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল! আর মনকে চোখ ঠার্‌য়ে কি হবে? ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করিয়াছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বলতে লোক পেলেন না! মারি মিন্সের নাকে এক কিল। আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক্ ও সব কথা যাক্। ও পথেও ধর্ম্মের কাঁটা।

এ জন্মের সুখদুঃখ অনেক কাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে; বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়? কুন্দ যেখানে ছিল, সেইখানে থাকিলেই তার হাতছাড়া। সেই বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না। তবে সেইখানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ীমুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মিলে 'বাপু বাছা' ব'লে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করবেন? সূর্য্যমুখীর থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন, বলবো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট,—সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি খানখা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা, হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্তবাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই,—সবাই জানে যে, কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড়মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্য। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তা-হলে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির করবে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটে আমায় করিতে হবে।

"তা হলেই বাবু যোড়শোপচারে কুন্দের পূজা আরম্ভ করিবেন। এখন কুন্দ হলো বোকা মেয়ে, আমি হলেম সেয়ানা মেয়ে; আমি কুন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এরই মধ্যে তাহার অনেক যোগাড় হয়ে রয়েছে। মনে করলে, কুন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারি। আর যদি বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে করবো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা কলাটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমনটা হয়, তা হলেই আমার হলো।

দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দিব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে বাবুর ভালবাসাটা পেকে আসবে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্য্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল। তত দিন আমি বসে বসে কুন্দকে উঠ্ বস্ করান মক্‌শ করাই। আগে আয়ীকে কামারঘাটা পাঠাইয়া দিই, নইলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না।"

এইরূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠা হীরা সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইল। ছল করিয়া আয়ীকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়া দিল এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ, তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ আর নাই। কমলও আমায় এত ভালবাসে না।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে! কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ না হলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাহাদের অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

এক দিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মুনিব-বাড়ী আসিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্তা হইল। কৌশল্যানাম্নী আর এক জন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত, এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভুপত্নীর প্রসাদপুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন কেমন করতেছে, তুই আমার কাজগুল কর্ না?" কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তা করিব বই কি। সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মুনিবের চাকর—করিব না?" হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্যা যে উত্তরই দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মস্তক হেলাইয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি লা কুশি—তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখতে পাই? তুই গালি দিস্!" কৌশল্যা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?"

হীরা। আ মলো! আবার বলে কখন গাল দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মরতে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভাল মন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বোলবে, উনি আশীর্ব্বাদ করলেন! তোর শরীরের ভাল মন্দ হউক।

কৌ। হয় হউক। তা বন্ রাগ করিস্ কেন? মরিতে ত হবেই এক দিন—যম ত আর তোকেও ভুলবে না, আমাকেও ভুলবে না।

হীরা। তোমাকে যেন প্রাতর্ব্বাক্যে কখনও না ভোলে। তুমি আমার হিংসায় মর! তুমি যেন হিংসাতেই মর! শীগ্‌গির অল্লাই যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন চুটি চক্ষের মাথা খাও!

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল, "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ারমুখি! আবাগি! শতেক খোয়ারি!" কোন্দল-বিদ্যায় হীরার অপেক্ষা কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটকেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল। যাইবার সময় যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধলক্ষণ—এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্য্যমুখী নালিশী আরজি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গাল—দোষ সব তোর—আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয় যা, আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়। তখন "আচ্ছা, চল্লেম" বলিয়া হীরা চক্ষের জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্ব্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, কাঁদিতেছিস্ কেন?"

হী। আমার মাহিনা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন। (সবিস্ময়ে) সে কি? কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই ?

হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাজের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি বল্।"

হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন ?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলো মেলো হয়েছে—কারে কখন কি বলেন, ঠিক নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সে কি ?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল, "সেদিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন,—আমরা তা হলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

ন। সে কি কথা ?

হী। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া, নগেন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, "আজ বাড়ী যা। কাল ডাকাব।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে ?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম ?"

ন। কোন দুর্ব্বাক্য ?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন, বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব ? কখনও কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব ? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষ কহিলেন, "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে ? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না ?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন ?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে বলিতে সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা—সাধ্বী—নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না ?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগলচরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশির-সিক্ত-কমলতুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিব তোমায় ? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি ? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়া-ছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা

নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না। তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেন না, অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ!"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিবেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী—কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র, সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব? আমি কি

মনে করিলে ইহার প্রতীকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "এক ভিক্ষা।"

ন। কি?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের উপর বাটপাড়ি

হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সংবাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে দিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সেদিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসীমহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।—

দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্টা নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু, বাহির হইতে

শিকল এবং তাহাতে তালা চাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা চাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, পুরুষ মানুষ। কিন্তু কে কার কে, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষে তাহার মনে মনে সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল। হীরা বাবুদিগের বাড়ী হইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল। দেখিল, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও মা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের দ্বারে ঘা মারিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "কুন্দ ঠাকুরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হয়েছে।" সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে হীরা তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্পার কি ওস্পার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা "পার্টি" ছিল—সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পর দিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরের পাখী

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" দুইটি ভিন্নদিগভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগে বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে তাহাই হইল। এদিকে মহালজ্জা—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয়প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে একবারও দেখিতে পাই না। তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয়?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায়। তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কি না, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দ্দশা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা ত যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তা হলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এক দিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্রশৈবালাদিসমাচ্ছন্ন জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্টলক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুক্কুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রকৃতি

স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে সন্দেহমন্দপদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে—ইতিমধ্যে এক দিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কিন্তু লুকাইয়া দেখিবে কখন? কি প্রকারে? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্তদিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারিদিকে বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই অমনি কুন্দ ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রের গৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথপানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই—ছাদপানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক—আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীরমধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকারক্ষক দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটনের ও অবরোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছিল। শেষ উষাসমাগমসূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল—আর ত ঝাউতলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল—কেহ দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থে কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুরসংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ুসেবন করিয়া থাকেন। হয়ত নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত। খিড়কীর দ্বার মুক্ত না হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কীর দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং উদ্যান-প্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজিপরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে প্রস্তররচিত সুন্দর পথ, স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকাসকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে, উড়িতেছে—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর-সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাত বায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছে না; কেন না, তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলা-বাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।

উদ্যানমধ্যস্থলে, একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত লতামণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহার প্রস্তর-নির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিল না—পশ্চাদপসৃতও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যান-মধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি?"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "কুন্দ! এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অবতরণ

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস্ কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে—আমার খানাতল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহা যাহা জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, "প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা, আর একটু বসিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কাণা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাত্রি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর এক পদ নামিতে হয়, তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখানে একটু বসিয়া জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি।

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপাবাঁধা হুঁকা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পুরিয়া মিঠাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ, নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোলকটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ঘাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "এক জন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।" দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকালজন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী—আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্তস্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, হীরা?"

হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হী। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন?

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।

হীরা রাগিল—বলিল, "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন্ স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড়মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।" দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গি করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কোমলতর স্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভু, আমি আপনার রূপগুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই—কিন্তু অবলা স্ত্রীজাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনি আপনি এখান হইতে যান।"

দেবেন্দ্র আর এক ঢোক পান করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে এক দিন বক্তৃতা দিবে?"

হীরা এই উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, রোষকাতরস্বরে কহিল, "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভালবাসিলেও, তাহার ভালবাসা লইয়া তামাসা করা ভাল নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকুও ভালবাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার গৌরব ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ছাড়েন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কালে আমাকে হয়ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি মনে রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন

স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যেদিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।"

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এই তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যেদিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

খোস্ খবর

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোক জন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। বৈঠকখানার চাবি বন্ধ। একটা দোআঁসলা গোছ টেরিয়র বৈঠকখানার বাহিরে, পাপোসের উপর, পাঁয়ের ভিতর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাকু খাইতেছে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সুচী-হস্তে কার্পেট তুলিতেছেন—কেশ বেশ একটু একটু আলু থালু—কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন, এবং বুকে লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া, একটা মৃন্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ডলেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দূরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ভাব অতি গম্ভীর; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ; এবং চিত্ত চাঞ্চল্যশূন্য। বোধ হয় বিড়াল ভাবিতেছিল, "মানুষের দশা অতি ভয়ানক, সর্ব্বদা কার্পেটতোলা, পুতুল-খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মন নিবিষ্ট, ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি নাই, বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে?" অন্যত্র একটা টিকটিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সেও মক্ষিকাজাতির দুশ্চরিত্রের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, সন্দেহ নাই। একটি

প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল—পিপীলিকারাও সার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে, টিক্‌টিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্য দিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্যচরিত্র পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া, হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কার্পেট রাখিলেন এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, "অ, শতু বাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন বলিতে পার ?" সতু বাবু বলিলেন, "ইলি—লি—ব্লি।"

ক। সতু বাবু, কখনও আপিসে যেও না।

সতু বলিল, "হাম্!"

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করার ভাবনা কি? তোমার হাম্ করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না—আপিসে গেলে বৌ দুপর বেলা বসে বসে কাঁদবে।"

সতু বাবু বৌ কথাটা বুঝিলেন ; কেন না, কমলমণি সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে, বৌ আসিয়া মারিবে। সতু বাবু এবার উত্তর করিলেন, "বৌ—মাবে !"

কমল বলিলেন, "মনে থাকে যেন। আপিসে গেলে বৌ মারিবে।"

এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না ; কেন না, এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া একখানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ণ মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ ;—

"প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে এক-খানি বই পত্র লিখিলে না কেন ? তোমার সংবাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না ?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে—ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোস্ খবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি ? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও। কেন না, তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।"

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ ততক্ষণ সম্মুখে একখানা বাঙ্গালা কেতাব পাইয়া তাহার কোণ খাইতেছিল, কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি, বল দেখি, সতু বাবু?" সতু বাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকা-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন। সতু বাবুর নাসিকা-ভোজন সমাপ্ত হইলে, কমলমণি আবার সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ সতু বাবুর কর্ম্ম নয়, এ আমার সেই মন্ত্রীটি নহিলে হইবে না। মন্ত্রীর আপিস কি ফুরায় না? সতু বাবু, আজ এস আমরা রাগ করিয়া থাকি।"

যথাসময়ে মন্ত্রিবর শ্রীশচন্দ্র আপিস হইতে আসিয়া ধড়া চূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাটের উপর শুইলেন। শ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁক্কা লইয়া দূরে কৌচের উপর গিয়া বসিলেন। হুঁক্কাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "হে হুঁক্কে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে! নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এইখানে বসিয়া দশ ছিলিম তামাক পোড়াব!" শুনিয়া, কমলমণি উঠিয়া বসিয়া, মধুর কোপে, নীলোৎপলতুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "আর দশ ছিলিম তামাক মানে না! এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটি কথা কইতে পাই না—আবার দশ ছিলিম তামাক খায়—আমি আর কি ভেসে এসেছি!" এই বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হুঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাকু-ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিলেন।

এইরূপে কমলমণির দুর্জ্জয় মান ভঞ্জন হইলে, তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে দিলেন এবং বলিলেন, "ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নহিলে আজ মন্ত্রিবরের মাহিয়ানা কাটিব।"

শ্রীশ। বরং আগাম মাহিয়ানা দাও—অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাহিয়ানা আদায় করিলেন। তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা!"

কম। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা না পত্রখানা?

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। আজি মন্ত্রিমশাইকে ডিস্চার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধিটুকুও নাই? মেয়েমানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?

শ্রীশ। তবে যা তামাসা কোরে পারে না, তা সত্য সত্য পারে?

কম। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয়, এ সত্য।

শ্রীশ। সে কি! সত্য, সত্য?

কম। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন, "আচ্ছা, মিথ্যা বলি ত কমলমণির সতীনের মাথা খাই।"

শ্রীশ। তা হলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

কম। ভাল, কারু মাথা নাই খেলেম—এখন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খায়। দাদা বুঝি জোর করে বিয়ে কর্‌তেছে?

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?"

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই :—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকীও নাই।

"এ কথা বলার পর আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

"যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত? য়িহুদার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি য়িহুদী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বলিব?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃ-নিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাঁহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া তুমি আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নীকণ্টক করি কেন? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি?

"তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

কাহার আপত্তি

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, "কোন্ কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু কি ভ্রম! পুরুষে বুঝি কিছুই বুঝে না। যা হোক, মন্ত্রিবর আপনি সজ্জা করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"

শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?

কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।

তখন উভয়ে গোবিন্দপুর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করেন?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; এবার সতীশ যে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতর, প্রবেশ করিয়া, স্পষ্ট স্বরে, সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সূর্য্যমুখী কোথায়?" মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে সূর্য্যমুখী মরিয়াছে।

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়নগৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়নগৃহে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে দেখিতে পাইলেন, ঘরের কোণে, এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে, অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু চিনিলেন যে সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী তাহার পদধ্বনি পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া কমলমণি, বিবাহ হইয়াছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে—নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে—সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো?" সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল।"

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দ-নন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক একবার মনে পড়িতেছিল, "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি!"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহবৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, ""আমি কে?"—মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—বৃষ্টির পর আকাশপ্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস;—তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, 'প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব',—তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

কমল। আর, তুমি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ—সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল।

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!—

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দ্দাহ হতেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণে ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া, আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন, যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী তখন আপনার কথা ত্যাগ করিয়া, অন্যান্য কথা পাড়িলেন। সতীশচন্দ্রকে আনাইয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সতীশ শ্রীশচন্দ্রের কথা

কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুখের কথার আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া সূর্য্যমুখী কমলকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং সতীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উভয়কে বিদায় দিবার কালে সূর্য্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসম্বরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

সূর্য্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি হইতেছে—কি? বল না?"

সূ। কিছু না।

কম। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে শয়নমন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন। পত্র খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল না—তাহা করতলে বিমর্দ্দিত করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে যাইবার সময়ে বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?" সতীশ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আশীর্ব্বাদ-পত্র

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে, কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্রখানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ;—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে

সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোনা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার

উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যত দিন না মাটিতে এ মাটি মিশে. তত দিন থাকিবে। কেন না, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষ কি?

যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্রবিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি

আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা ; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগ শরীর; সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী ; এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী ; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী ; স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্মে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা, মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন ; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন ; বন্ধুর হিতকারী ; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্ ; অনুগতের প্রতিপালক ; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ ; কার্য্যে সরল ; আলাপে নম্র ; রহস্যে বাঙ্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ ;—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ ; অনুগত ভৃত্য ; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি ; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই ; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল ; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর ; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্বেষণ

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সংবাদ গৃহমধ্যে রাষ্ট হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারি দিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, কমলমণি চারি দিকে লোক পাঠাইলেন। বড় বড় দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছুটিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, তূলভরা ফরাশীর ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মস্‌মস্ করিয়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খান্‌সামারা গামছা কাঁদে, গোট কাঁকালে, মাঠাকুরাণীকে ফিরাতে চলিল। কতকগুলি আত্মীয় লোক গাড়ি লইয়া বড় রাস্তায় গেল। গ্রামস্থ লোক মাঠে ঘাটে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল; কোথাও বা গাছতলায় কমিটি করিয়া তামাকু পোড়াইতে লাগিল। ভদ্রলোকেরাও বারোইয়ারির আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায়কচ্‌কচি ঠাকুরের টোলে এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী ছাগী স্নানের ঘাটগুলাকে ছোট আদালত করিয়া তুলিল। বালকমহলে ঘোর পর্ব্বাহ বাধিয়া গেল; অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটি হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখনও পথ হাঁটেন নাই—কত দূর যাইবেন? এক পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন। এইরূপ দিনমান গেল।

বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সূর্য্যমুখী কখনও পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন নাই। কতদূর যাইবেন? বাটী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্রবাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল। চিনিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আসুন!"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে, আসুন! বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" সূর্য্যমুখী তখন ক্রোধভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সংবাদ দিল। নগেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্য্যমুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্য্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু সূর্য্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সেও সন্ধানে ছিল। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কি আমাদের মা ঠাকুরাণী গা?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না বাছা!"

বুড়ী বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের মা ঠাকুরাণী।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমাদের মা ঠাকুরাণী কে গা?"

বুড়ী বলিল, "বাবুদের বাড়ীর বউ গা।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার গায়ে কি সোনা দানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?"

বুড়ী ভাবিল, "তাও ত বটে?"

সে তখন কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল। রাত্রেও কোন ফললাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য্যসিদ্ধি হইল না—অথচ অনুসন্ধানের ক্রটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারীরা প্রায় কেহই সূর্য্যমুখীকে চিনিত না—তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরীব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে হাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা "মা ঠাকুরাণী" বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পাল্কী, বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনা ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

শ্রীশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কমলমণি, গোবিন্দপুরে থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সকল সুখেরই সীমা আছে

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।" দেখিলেন, সুখের সীমা আছে।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই—অথচ দুই জনেই নীরব—সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

কিন্তু সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি ইঁহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্ব্বদা মনে ভাবিতেন, "কি করিলে, আবার যেমন ছিল, তেমনি হয়।" আজিকার দিন, এই সময়, কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।"

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন—কিন্তু নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত রহিলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেক ক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?" কুন্দ কহিলেন, "না।"

ন। কেবল একটি ছোট্টো "না" বলিয়া আবার চুপ করিলে। তুমি কি আমায় আর ভালবাস না ?

কু। বাসি বই কি ?

ন। "বাসি বই কি ?" এ যে বালক-ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভালবাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন না, আর কি বলিবেন ? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন ?—লোহার শিকলই ভাল।"

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার কাছে রোদন করেন। কমলমণি আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী, আপনাকে এ বিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। সে দিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দ-নন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না ; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে।" অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষের ফল

(হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র)

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সকলেই মাটি খোঁড়ে, কোহিনুর এক জনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কোহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বই কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি তাহাকে ভালবাসিতাম?" ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি

(হরদেব ঘোষালের উত্তর)

আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে—এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল চোখের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।

তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমন গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্য আর তিরস্কার করিব না—কেন না, তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে

তাহার অপনোদন বড় কঠিন। মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই," অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডুয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি;— বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা, এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসারও মূল এইরূপ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে—কেন না, উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্র জন্মে; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হইলে, রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান্ ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণস্থল।

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তোমাকে তিরস্কার করিব না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা কর।

তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না; কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

(নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর)

তোমার পত্র পাইয়া, মানসিক ক্লেশের কারণ, এ পর্য্যন্ত উত্তর দিই নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে সৎপরামর্শ তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মনঃস্থির করিতে পারি না। এক মাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমিও গৃহত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দ-নন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে,—আমি কি করিব? আমি

চলিলাম, শীঘ্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি।

নগেন্দ্রনাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেইরূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপরই ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং এ আখ্যায়িকার লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একাই দত্তদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন, আর হীরা দাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপসমুজ্জ্বল, বহুলোক-সমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর, অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী সূর্য্যমুখীনগেন্দ্রকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সেইরূপ আঁধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী, ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বনদাহকালীন শাবকসহিত পক্ষিনীড় দগ্ধ হইলে, পক্ষিণী আহার লইয়া আসিয়া দেখে, বৃক্ষ নাই, বাসা নাই, শাবক নাই; তখন বিহঙ্গী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেইরূপ সূর্য্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন অনন্তসাগরে অতলজলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দে া যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপণীয়া হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরূপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেক বার হীরার ধর্ম্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্তসংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্ম্মভীতা না হইয়াও এ পর্য্যন্ত সতীত্বধর্ম্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল।

সেই ক্ষমতাপ্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

হীরার পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি স্বীকার করার আর একটি কারণ ছিল। হীরা পূর্ব্বে অর্থাদি কামনায়, কুন্দকে নগেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া স্বীয় বশীভূত করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের হস্তগত হইবে, কুন্দের হস্তগত অর্থ হীরার হইবে। এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহিণী হইল। অর্থসম্বন্ধে কুন্দের কোন বিশেষ আধিপত্য জন্মিল না, কিন্তু এখন সে কথা হীরারও মনে স্থান পাইল না। হীরার অর্থে আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।

হীরা, আপন নিষ্ফল প্রণয়যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশ পরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীকে স্মরণে হীরার মহাভয়সঞ্চার হইল। হীরা, হরিদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গলকামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপরে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গলচিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।

হীরা দাসী, কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল যে, হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্তস্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখনও তাহাকে কিছু বলিত না। কুন্দ শীতলপ্রকৃতি, হীরা উগ্র-প্রকৃতি। এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল। পুরবাসিনীরা কখনও কখনও কুন্দের যন্ত্রণা

দেখিয়া হীরাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাঙ্ময়ী হীরার নিকট তাল কাঁদিতে পারিত না। দেওয়ানজী, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।" শুনিয়া হীরা রোষবিস্ফারিতলোচনে দেওয়ানজীকে কহিল, "তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছেন। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমারও সে ক্ষমতা।" শুনিয়া দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্য্যমুখী নহিলে কেহ হীরাকে শাসিত করিতে পারিত না।

এক দিন নগেন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরারই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে। উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমালা প্রতিফলিত হইতেছে। লতাপল্লবরন্ধ্রমধ্য হইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেতপ্রস্তরময় হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়াছে এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তাড়িত স্বচ্ছ জলের উপর নাচিতেছে। উদ্যানপুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। এমত সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপ-মধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র। অদ্য দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন, নিজবেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যেখানে হীরা আছে, সেখানে আমার ভয় কি?" এই বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছেন। যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা ত পাইয়াছি। আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপটালাপে প্রতারিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল, "আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। যাহা হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া মনের তৃপ্তি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন। এখানে অনেক বিঘ্ন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় যাইব?"

হীরা বলিল, "যেখানে কোন ভয় নাই। আপনার সেই নিকুঞ্জ বনে চলুন।"

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করিও না।

হী। যদি আপনার জন্য ভয় না থাকে, আমার জন্য ভয় করিতে হয়। আমাকে আপনার কাছে কেহ দেখিলে, আমার দশা কি হইবে ?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "তবে চল। তোমাদের নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না ?"

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি যে ঈর্ষ্যানলজ্বলিত কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অস্পষ্টালোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা কহিল, "তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে ?"

দেবেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া হীরা লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া এক বৃক্ষান্তরালে বসিল এবং তখন তাহার কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে কহিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুরমধ্য দিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর হইতে কালো কালো গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। তেওয়ারি গোষ্ঠী কিছু দূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবান্ কর্ত্তৃক "শ্বশুরা" "শালা" প্রভৃতি প্রিয়সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এমত আমরা শুনিয়াছি। এবং তাঁহার ভৃত্য এক দিন তাঁহার প্রসাদী ব্রাণ্ডি খাইয়া পরদিবস আপন উপপত্নীর নিকট গল্প করিয়াছিল যে, "আজ বাবুকে তেল মাখাইবার সময়ে দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা কালশিরা দাগ।"

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরকল্প হইলেন। প্রথম হীরা থাকিতে তিনি আর দত্তবাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমত গুরুতর

শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে, পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পথিপার্শ্বে

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দনরেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু

আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্ত্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে, দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাঁহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসজ্ঞ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আসছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ্গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন;—এবং শত স্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন ?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু করে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা ?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল, "আমি কোথা ?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে ?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি কি সধবা ?

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমণি অপ্রতিভ হইল।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব ? তোমার নাম কি ?

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আশাপথে

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইহার কাস রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।

এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটি রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপিশাচ ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।

সূর্য্য। তবে, আমাকে রাখিয়া, আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন—আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রে যখন পথে পড়িয়াছিলাম—তখন নিতান্ত আশা করিয়াছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না—কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যাতুল্য পাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এই জন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যত বার মরিবার কথা হইল, তত বার তোমার চক্ষে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখনিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব বলিয়াই, হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এ সময়ে কেন করি? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়—কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি, সংবাদ দিলে, এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।"

সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, "তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি তত দিন বাঁচিব কি?"

ব্র। কত দূরে সে?

সূ। হরিপুর জেলা।

ব্র। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া আসিলেন, এবং সূর্য্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন।—

"আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনি কে তাহাও আমি জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে, শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী

আপনার ভার্য্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে এ পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকালে একবার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি ইঁহাকে মাতৃসম্বোধন করি। পুত্রস্বরূপ তাঁহার অনুমতিক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

"যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান্ মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

"আসিতে হয় ত, শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। ইতি শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা।"

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নামে শিরোনামা দিব?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "হরমণি আসিলে বলিব।"

হরমণি আসিলে নগেন্দ্রনাথ দত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্রখানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্য্যমুখী সজলনয়নে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পৌঁছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দরওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, আমি যখন যেখানে পৌঁছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে আমার নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্ব্বেই নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকা-পথে কাশীযাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে

আমার পত্রাদি পাঠাইবে।" দেওয়ান সেই সংবাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্সমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া, অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন, "জগদীশ্বর! মুহূর্ত্তজন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল ; মুহূর্ত্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল ; কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া, অচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাতে করিলেন। ভুবনসুন্দরী বারাণসি, কোন্ সুখী জন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা ; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র!—অনন্ত তেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরঙ্গিণীহৃদয় ; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এইরূপ আলোকরাজিশোভিত অনন্ত-প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী,—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহার আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পর পৌঁছিয়াছে—এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

যে দিন পাঁড়ে গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হীরা মনে মনে বড় হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি তাঁহাকে অপমানিত

করিয়া ভাল করি নাই। তিনি না জানি মনে মনে আমার উপর কত রাগ করিয়াছেন। একে ত আমি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান পাই নাই ; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।”

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কামসিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতী দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা, দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না—ভূতপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন ঊর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা-মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতববাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয় ; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপধায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধি লোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া, তানপূরা লইলেন এবং সুরাপানসমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রেমবিদ্রাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব্বসংসারসুন্দর, সর্ব্বার্থসার, রমণীর সর্ব্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপূরা রাখিয়া, সযত্নে আপন বসনাগ্রভাগে হীরার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন। হীরার শরীর পুলককণ্টকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্যপরিহাসসংযুক্ত সরস সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখনও বা এরূপ প্রণয়ীর অনুরূপ স্নেহসিক্ত, অস্পষ্টালঙ্কারবচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানহীনা, অপরিমার্জ্জিত-বাগ্‌বুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্গ-সুখ। হীরা ত কখনও এমন কথা শুনে নাই। হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গপরিমার্জ্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল—প্রেম কাহাকে বলে, দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গত করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল—কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের মুখে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মহিমাকীর্ত্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমানুষিকচিত্তসম্পন্ন মনে করিল—স্বয়ং আপাদকবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল।

তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথমবসন্তপ্রেরিত একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বরে, সঙ্গীতোত্তম করিলেন। হীরা দুর্দ্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্ত্তিপ্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। চিত্তস্ফূর্ত্তিবশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চ স্বর উঠিল। হীরা যাহা গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য—প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া পাপান্তঃকরণ দুই জনে, পাপাভিলাষবশীভূত হইয়া চিরপাপরূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্ত সংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যত দূর অভিলাষ করিয়াছিল, তত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও, অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত অব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিল না।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর সংবাদ

বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমতকালে কার্ত্তিক মাসের এক দিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে, খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের

ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল—অবাক্ হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। বউগুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাষারা কার্ত্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরলোকে অমনি কমিটিতে বসিয়া গেল। পাল্কীর ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল—কেন না, তাঁহার পেণ্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল! কেহ ভাবিল, দারোগা; কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্র শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনি মামলার সুরতহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলে মানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, এক জন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্র লোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন এক জন বিশিষ্টলোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায়, এক জন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ তিনি এক স্থানে স্থায়ী নহেন; সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন, তাহা কেহ জানে?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন এখান হইতে গিয়াছেন?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে গিয়াছেন।

নগেন্দ্র। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায় আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে?"

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত?"

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, "না; কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাসরোগগ্রস্ত ছিল—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম—এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে কি—?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।"

নগেন্দ্রনাথ চৌকি হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন, সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্যশিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেইখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিবেন।

তখন মনে করিলেন, "এ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজব্যয়ার্থ রাখিলাম, সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?" তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

উনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না

রাত্রি প্রহরেকের সময়ে শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমত সময়— পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তবাহিত কান্‌বাস ব্যাগ্‌ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ্‌ রাখিয়া নীরবে একখানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন, মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন এবং পত্র পাইয়া, মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্র এই মাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম!"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?"

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র উর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে!"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" এ কথা সহ্য হয় না—"সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন"—এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। তখন পরের কথা বিষবোধ হইবে। পরের সংসর্গও বিষ। এই বুঝিয়া, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; মনে মনে করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন।

কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আলুলায়িত কুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধূলিধূসরা, নীরবে রোদনপরায়ণা দেখিয়া, প্রথমে নীরবে, নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি, সতীশের অঙ্গে হস্তপ্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া, মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল। সে বালক-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন কে সে বালক-রোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?

শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য। কেন না, গতকল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

নগেন্দ্র। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?

শ্রীশ। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুর আসিয়াছিলেন। গোবিন্দপুরেও তোমায় পাইলেন না, কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সংবাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসলেন। পরশ্ব দিন আমার কাছে আসিয়া-ছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ

পাইবার ভরসায় কালি গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নগেন্দ্র। আমি কালি রাণীগঞ্জে ছিলাম না। সূর্য্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?

শ্রীশ। সে সকল কালি বলিব।

নগেন্দ্র। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশবৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল।

তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও অপেক্ষাকৃত আরোগ্য লাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন,—সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সে সকল বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে পথে নগেন্দ্র রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতোমধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল—আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে? তখন পুনর্ব্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি?"

শ্রীশ। আজি আর সে সকল কথায় কাজ কি? আজ শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।

নগেন্দ্র ভ্রূকুটী করিয়া মহাপরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "বল।" শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন; বিদ্যুদগর্ভ মেঘের মত তাঁহার মুখ কালিময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল; শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গোবিন্দপুর হইতে সূর্য্যমুখী স্থলপথে অল্প অল্প করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিকে আসিয়াছিলেন।"

নগেন্দ্র। প্রত্যহ কত পথ চলিতেন?

শ্রীশ। এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ।

নগেন্দ্র। তিনি ত একটি পয়সাও লইয়া বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইত কিসে?

শ্রীশ। কোন দিন উপবাস—কোন দিন ভিক্ষা—তুমি পাগল!!

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেন না, নগেন্দ্র আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠরোধ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "বল।"

শ্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদ্রিতনয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়া আছেন; চারিদিক্ হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারি দিকে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শতচন্দ্র জ্বলিতেছে; চারি পার্শ্বে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনাবিধান করিলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্য্যমুখি! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরবে বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, "বল।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, "আর কি বলিব?"

নগেন্দ্র। বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সূর্য্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট পান নাই। একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন, একদিন নদীকূলে সূর্য্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্য্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও কাশী যাইবেন।"

নগেন্দ্র। সে ব্রাহ্মণের নাম কি? বাটী কোথায়?

নগেন্দ্র মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

শ্রীশ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্য্যমুখী বর্হি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক্-ট্রেণে গিয়াছিলেন ; এ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া ক্লেশ পান নাই।

নগেন্দ্র। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিল ?

শ্রীশ। না ; সূর্য্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কত দিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন ? তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের বাটী আসিয়া এ পর্য্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই—তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধশোক-প্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। উহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দূত।

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এ সব কথায় আজ আর আবশ্যক নাই।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি ? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বর্হি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথহাঁটার পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্র বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয়ে আর মনের ক্লেশে সূর্য্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন ?"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব ? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন তাঁরই সকল দোষ ; তিনি কেন বিষ-বৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই ?

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষের ফল

হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু এক দিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এক কড়া কাণা কড়ি। কেন না, দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত ; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোন কোন কৃপণ অথচ যশোলিপ্সু ব্যক্তি বহু-কালাবধি প্রাণপণে সঞ্চিতার্থ রক্ষা করিয়া, পুত্রোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে এক দিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, হীরা তেমনি এত দিন যত্নে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, এক দিনের সুখের জন্য তাহা নষ্ট করিয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপণের ন্যায় চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্ত্তৃক অল্পোপভুক্ত অপক্ক চূতফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে—সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, দেখা সাক্ষাতের শেষ দিনে হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না," তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এত দূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম ; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।"

হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুটী কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া, যেন শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা, পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকেই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপ তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে এক জন চাণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চাণ্ডালাদি ইতরজাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ

কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষবড়ি প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ্জবিষ, খনিজ বিষ, সর্পবিষাদি নানা প্রকার সদ্যঃপ্রাণাপহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, "একটা শিয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সেই শিয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে আজি হাঁড়ি খাইতে আসিলে বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে ; সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার ?"

চাণ্ডাল শিয়ালের গল্পে বিশ্বাস করিল না। বলিল, "আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে ; কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিসে ধরিবে।"

হীরা কহিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্টদেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।"

চাণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণবিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বিষবিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চাণ্ডালকে দিল। চাণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, "দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল।"

চাণ্ডাল কহিল, "মা! আমি তোমাকে চিনিও না।" হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেক রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল. "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব ? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন ? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।"

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার আয়ি

"হীরার আয়ি বুড়ী।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙ্গে মুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ি।"

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়ি গুড়ি যাইতেছিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকের পাল, এই অপূর্ব্ব কবিতাটি পাঠ করিতে করিতে করতালি দিতে দিতে এবং নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে কোন বিশেষ নিন্দার কথা ছিল কি না, সন্দেহ—কিন্তু হীরার আয়ি বিলক্ষণ কোপাবিষ্ট হইয়াছিল। সে বালকদিগকে যমের বাড়ী যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছিল—এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অন্যায় ব্যবস্থা করিতেছিল। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আয়ি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বারবান্‌দিগের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পলায়নকালে কোন বালক বলিল ;—

"রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পালাবে ?"

কেহ বলিল ;—

"রাম দীন পাঁড়ে,
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে,
চোর দেখ্‌লে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।"

কেহ বলিল ;—

"লালচাঁদ সিং,
নাচে তিড়িং মিড়িং,
ডালরুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।"

বালকেরা দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা নানাবিধ অভিধান ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া চিনিয়া বুড়ী কহিল, "হাঁ বাবা—ডাক্তার বাবা কোথা গা ?" ডাক্তার কহিলেন, "আমিই ত ডাক্তার।" বুড়ী কহিল, "আর বাবা, চোকে দেখতে পাই নে—বয়স হ'ল পাঁচ সাত গণ্ডা, কি এক পোনই হয়—আমার দুঃখের কথা বলিব কি—একটি বেটা ছিল, তা যমকে দিলাম—এখন একটি নাতিনী ছিল, তারও—" বলিয়া বুড়ী হাঁউ—মাউ—খাঁউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে তোর ?"

বুড়ী সে কথার উত্তর না দিয়া আপনার জীবনচরিত আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেক কাঁদাকাটার পর তাহা সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "এখন তুই চাহিস্ কি ? তোর কি হইয়াছে ?"

বুড়ী তখন পুনর্ব্বার আপন জীবনচরিতের অপূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাতার, ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবনচরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহু কষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন—কেন না, তাহাতে আত্মপরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহুল্য।

মর্ম্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে। রোগ, বাতিক। হীরা গর্ব্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—তাহাতে কখনও মাতৃ-ব্যাধির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু আজিকালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখনও কখনও একা হাসে—একা কাঁদে, কখনও বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচে। কখনও চীৎকার করে। কখনও মূর্চ্ছা যায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধ চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোর নাতিনীর হিষ্টীরিয়া হইয়াছে।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা ! ইষ্টিরসের ঔষধ নাই ?"

ডাক্তার বলিলেন, "ঔষধ আছে বই কি। উহাকে খুব গরমে রাখিস্ আর এই কাষ্টর-অয়েল্‌টুকু লইয়া যা, কাল প্রাতে খাওয়াইস্। পরে অন্য ঔষধ দিব।" ডাক্তার বাবুর বিদ্যাটা ঐ রকম।

বুড়ী কাষ্টর-অয়েলের শিশি হাতে, লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া চলিল। পথে এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরের আয়ি, তোমার হাতে ও কি?"

হীরার আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়াছে। তা হাঁ গা কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তা হবেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। ত তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পারে। আচ্ছা, হীরার আয়ি, তোর নাতিনীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে?" হীরার আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়স-দোষে অমন হয়।"

প্রতিবাসিনী কহিল, "একটু কৈলে বাচুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনিয়াছি, তাহাতে বড় রস পরিপাক পায়।"

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সম্মুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর! আগুন কেন?"

বুড়ী বলিল, "ডাক্তার তোকে গরম করতে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

অন্ধকার পুরী—অন্ধকার জীবন

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারি বাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায়? কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধূলার রাশি, কার্ণিসে কার্ণিসে পায়রার বাসা, কড়িতে কড়িতে চড়ুই। বাগানে শুক্‌না পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে

শিয়ালা, ফুলবাগানে জঙ্গল, ভাণ্ডার ঘরে ইন্দুর। জিনিষপত্র ঘেরাটোপে ঢাকা। অনেকেতেই ছাতা ধরেছে। অনেক ইন্দুরে কেটেছে। ছুঁচা, বিছা, বাদুড়, চামচিকে অন্ধকারে অন্ধকারে দিবারাত্র বেড়াইতেছে। সূর্য্যমুখীর পোষা পাখীগুলাকে প্রায় বিড়ালে ভক্ষণ করিয়াছে। কোথাও কোথাও ভোজনাবশিষ্ট পাখাগুলি পড়িয়া আছে। হাঁসগুলা শৃগালে মারিয়াছে। ময়ূরগুলা বুনো হইয়া গিয়াছে। গোরুগুলার হাড় উঠিয়াছে—আর দুধ দেয় না। নগেন্দ্রের কুক্কুরগুলার স্ফূর্ত্তি নাই—খেলা নাই, ডাক নাই—বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে—কোনটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াগুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আস্তাবলে যেখানে সেখানে খড় কুটা, শুক্‌না পাতা, ঘাস, ধূলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস দানা কখনও পায়, কখনও পায় না। সহিসেরা প্রায় আস্তাবলমুখ হয় না; সহিস্‌নীমহলেই থাকে। অট্টালিকার কোথাও আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট খসিয়াছে; কোথাও সাসী, কোথাও খড়খড়ি, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। মেটিঙ্গের উপর বৃষ্টির জল, দেয়ালের পেণ্টের উপর বসুধারা, বুককেশের উপর কুমীরকার বাসা, ঝাড়ের ফানুসের উপর চড়ুইয়ের বাসার খড় কুটা। গৃহে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যে উদ্যানে মালী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখনও একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজনে খাইত পরিত, কুন্দও তাই। যদি কেহ তাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক দুড়্ দুড়্ করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজিকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেওয়ানজিকে যে পত্রগুলি লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না—সেইগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্রগুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম শুনিলেই কুন্দের মুখ শুকাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্রগুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক সূর্য্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম। প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে

আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। তার পর—এখন কোথায় সে চাঁদ? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্রিদিন ভাবে, রাত্রিদিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভালবাসুন—তাকে ভালবাসিবেন, কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন, কুন্দই এই বিপত্তির মূল, সকলেই ভাবে কুন্দই অনর্থের মূল। কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল?

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে।

আবার কুন্দ ভাবিত, "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন।" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু শুধু মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন

কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাতনাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজেষ্ট্রী হইবে এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দানপত্রাদির ব্যবস্থা, এবং পদব্রজে গমন ইত্যাদি কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপথ্যায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রীছাড়া

হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে।" কিন্তু কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতিন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সতিনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে হেসে বলতেছ, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে"—তোমার সতিন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন—তার পরে ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে—কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না; তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসব না?" এই ভাবিয়া কমলমণি রোদনত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই বোলে দাদা বাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অমনি শ্রীশচন্দ্র, রাজ, মজুর, ফরাস, মালী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেখানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে কমলমণির দৌরাত্ম্যে ছুঁচা, বাদুড়, চামচিকে মহলে বড় কিচি মিচি পড়িয়া গেল; পায়রাগুলা "বকম বকম" করিয়া এ কার্ণিশ ও কার্ণিশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, চড়ুইগুলা পলাইতে ব্যাকুল—যেখানে সাসী বন্ধ, সেখানে দ্বার খোলা মনে করিয়া, ঠোঁটে কাচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারিকারা ঝাঁটা হাতে

জনে জনে দিকে দিকে দিগ্বিজয়ে ছুটিল। অচিরাৎ অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল। চ

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী, প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ-শোক-প্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; কিন্তু অধৈর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল। নগেন্দ্র কেবল এক জনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

স্তিমিত প্রদীপে

নগেন্দ্রনাথের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে। সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির, এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে রচিত। কক্ষ-প্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। একপাশে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর একপাশে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতি নহে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর

এক জন ইংরেজের শিষ্য ; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বতশিখরে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী, মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণামজন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিতা। মস্তক নমিত হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে ; বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন ; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা, নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমানচতুষ্পার্শে নানাবর্ণের মেঘ,—নীল, লোহিত, শ্বেত,—ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্যকরে তরঙ্গসকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতিদূরে "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা—" তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী "তমালতালীবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবী সেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদিগের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘ সকল চূর্ণ করিতেছে ; সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতেছেন ; কুন্দদন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন ; রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলক সকল উড়িতেছে—দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, সাগরিকাবেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমালতলে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে

যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মুছিতেছেন, লতাপুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন—অনসূয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতেছে—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না—দুষ্মন্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন না—যাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে, রণসজ্জিত হইয়া সিংহশাবকতুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটিতে তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না। চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন। আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পাশে উচ্চ সৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া, বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদখণ্ডবৎ, নানালঙ্কারভূষিত প্রৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে নানারত্নাদিসহিত সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ঊর্দ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলাপাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী, উন্নতদেহবিশিষ্টা, পুষ্টকান্তিমতী, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন; এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ। তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামিপ্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষন্মাত্র অধরপ্রান্তে হাসি হাসিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন

শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারিদিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত কত পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে, সোণা রূপার তুলা ?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ডবেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে যেখানে মুক্ত ছিল, সেইখানে সেইখানে বজ্রতুল্যশব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সাসী সকল ঝনঝন শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর একটি দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া কত সুখের কথা বলিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয় চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল —তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্রপুত্তলি সজীব দেখাইতেছিল। প্রতিচিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী এক দিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয় ? আর এক দিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ি হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্যজন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্‌গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে

অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একবারে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বল্‌গা ধারণ করিয়া গাড়ি অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন। দেয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছিল—সূর্য্যমুখী তাহার অনুকরণমানসে একটি লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিন দোলে, সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া দেয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী এক স্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

'১৯১০ সম্বৎসরে

ইষ্টদেবতা

স্বামীর স্থাপনা জন্য

এই মন্দির

তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী

কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।'

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃপুনঃ লোপ হইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারিদিকে কবাটতাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক

অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ছায়া

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃসঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিশ? বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিশ নহে। কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনী? সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণ বারি নগেন্দ্রের কপোলদেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রুদ্ধনিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া বসিলেন।

এখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব্ব দিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ পাইয়াছিল—গৃহমধ্যেও আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন,

এ ত কুন্দনন্দিনী নহে। তখন এমন আলো নাই যে, মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আকার ও ভঙ্গী কতক কতক উপলব্ধ হইল। আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতর-স্বরে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "দেবীই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী কি বলিল, কপালদোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং দণ্ডায়মান স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন, শরীর দুই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। গৃহপার্শ্বে উদ্যান-মধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। শিরঃস্থ আলোকপন্থা হইতে বালসূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন আসিলে? আমি আজি সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে তবে কি সুখ হইত!" রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া, মৃদু মৃদু আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না, সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববৃত্তান্ত

যথাসময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া, তোমার উদ্দেশ্যে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। ইহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যে দিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনেই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত; তাহার একটি মরিয়া গিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সুবল ছিল, যে রুগ্ন সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন যে, তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, এই দিকে আসিয়াছ। তিনি

অমনি ব্যস্ত হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কালি বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পৌঁছিয়াছেন, আমিও শুনিয়াছিলাম যে, তুমি দুই এক দিন মধ্যে বাটী আসিবে। সেই প্রত্যাশায় আমি পরশ্ব এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্লেশ হয় না—পথ হাঁটিতে শিখিয়াছি। পরশ্ব তোমার আসা হয় নাই, শুনিয়া ফিরিয়া গেলাম, আবার কাল ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পৌঁছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম, তখনও খিড়কি দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না। সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে সিঁড়িতে উঠিলাম। মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি—কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। কপাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সরলা এবং সর্পী

যখন শয়নাগারে সুখসাগরে ভাসিতে ভাসিতে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী এই প্রাণস্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, পূর্ব্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকাসুলভ রোদন নহে—মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল

তাচ্ছল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এই রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, "কেন আমি স্বামিদর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম।" আরও ভাবিল যে, "এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি ?"

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয় বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্ব্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়নকালে, যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার রূপধারণ করিয়া, স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ্র, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদমধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প অল্প হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখানুরূপ। আরও দেখিল, মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীরভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন, "কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত ?"

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।" এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে।

কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীতভাব ধারণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সংবাদই ইহার কারণ। পূর্ব্বপরুষব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বরং হীরা,

পূর্ব্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপট্য সহজেই বুঝিতে পারিত—কিন্তু কুন্দ অসামান্যা সরলা এবং আশুসন্তুষ্টা—সুতরাং হীরার এই নূতন প্রিয়কারিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্টা হয় নাই। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্ব্বমত বিশ্বাসভাগিনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রুক্ষভাষিণী ভিন্ন অবিশ্বাসভাগিনী মনে করে নাই।

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকুরাণি, কাঁদিতেছ কেন?"

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?"

কুন্দ বলিল, "কিছু না।"

এই বলিয়া আবার সংবর্দ্ধিতবেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কহিলেন? আমরা দাসী, আমাদের কাছে তা বলিতে হয়।"

কুন্দ কহিল, "কোন কথাবার্ত্তা বলেন নাই।"

হীরা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি, মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?"

কুন্দ কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অসংবরণীয় হইল।

হীরা মনে মনে বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, "ছি মা, এতে কি কাঁদতে হয়? কত লোকের কত বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্বজন্য কাঁদিতেছ?"

"বড় বড় দুঃখ" আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

"আত্মহত্যা," এই মহা অমঙ্গলজনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর কানে দারুণ বাজিল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রিকালে অনেকবার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নরাঙ্কিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, "তবে আমার দুঃখের কথা বলি শুন। আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে—কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মুনিবের কাছে লুকাইলেই বা কি হইবে—স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।"

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তাহার কানে সেই "আত্মহত্যা" শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কানে কানে বলিতেছিল, "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে ; এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল ?"

হীরা বলিতে লাগিল, "সে আমার স্বামী নহে ; কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামীর অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমাকে ভালবাসিত না ; আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভালবাসিত না। এবং আমার অপেক্ষা শতগুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভালবাসিত।" ইহা বলিয়া হীরা নতনয়না কুন্দের প্রতি একবার অতি তীব্র কোপকটাক্ষ করিল, পরে বলিতে লাগিল, "আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁসিলাম না, কিন্তু একদিন আমাদের উভয়েরই দুর্বুদ্ধি হইল।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া, হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না ; দেবেন্দ্রের নাম, কুন্দের নাম, উভয়ই অব্যক্ত রহিল। এমত কোন কথা বলিল না যে, তদ্দারা, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়ীর প্রণয়িনী, তাহা অনুভূত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম ?"

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে ?" হীরা হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখনই চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবামাত্র মানুষ মরিয়া যায়।"

কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত, কহিল, "তার পর ?"

হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন ? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পূরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটি হীরা মুনিব-বাড়ীর প্রসাদ, পুরস্কার এবং অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানে রাখিত।

হীরা সেই বাক্সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল। বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার

প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনবশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমত সময় অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে মঙ্গলজনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কুন্দের কার্য্যতৎপরতা

হীরা আসিয়া শঙ্খধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকা সকলে মিলিয়া কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহাকলরব করিতেছে। যাহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুস্নিগ্ধ তৈলনিষিক্ত করিয়া, কেশরঞ্জিনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্ব্বচন কহিতেছে। বালক বালিকারা নাচিতেছে, গায়িতেছে, এবং করতালি দিতেছে। সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন ও হুলু দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন কখন এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, এক একবার নৃত্য করিতেছেন।

দেখিয়া হীরা বিস্মিত হইল। হীরা মণ্ডলমধ্যে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইল। দেখিল যে, সূর্য্যমুখী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহ হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহার রুক্ষ কেশভার কুসুম-সুবাসিত তৈলসিক্ত করিতেছে। কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে ; কেহ বা আর্দ্র গাত্রব্রক্ষণীর দ্বারা তাঁহার গাত্র পরিমার্জ্জিত করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পূর্ব্বপরিত্যক্ত অলঙ্কারসকল পরাইতেছে। সূর্য্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিন্তু লজ্জিতা, একটু একটু অপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার গণ্ডে স্নেহমুক্ত অশ্রু পড়িতেছে।

সূর্য্যমুখী মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে একজন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কে গা ?"

কথা কৌশল্যার কানে গেল। কৌশল্যা কহিল, "চেন না, নেকি? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা এত দিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজি দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে এবং সকলের সঙ্গে আলাপ কুশল শেষ হইলে, সূর্য্যমুখী কমলের কানে কানে বলিলেন, "তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"

কেবল কমল ও সূর্য্যমুখী কুন্দের সম্ভাষণে গেলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়নিক্লিষ্টবদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন। এবং অতিব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী রোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে একদিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?"

নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকাবয়স হইতেই মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"

নগেন্দ্র। সে কি?

সূ। তুমি তাহার কাছে থাক—আমি ডাক্তার বৈদ্য আনাইতেছি।

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু তেজোহীন হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এত দিনে মুখ ফুটিল

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া, ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া, নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল—কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, "ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্তকালে সবাই সমান।

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ, বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে

তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি বালিকা অবাক্‌পটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহপ্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।

কুন্দ আবার কিছুকাল বিশ্রামলাভ করিয়া, অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্টনিশ্বাস-সহকারে কহিতে লাগিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ, পর্য্যঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগলমধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুই জনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া স্বামীর চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।

প্রথম রোদন সংবরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্তধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্যা হইয়াছিল।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। এক বার মাত্র বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তদুপরি, মদ্যসেবার বিরতি না হওয়ায় রোগ দুর্নিবার্য্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরেক মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারি দিন পূর্ব্বে সে গৃহমধ্যে রুগ্নশয্যায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে—এমত সময় তাহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?" ভৃত্যেরা কহিল যে, "এক জন পাগ্‌লী আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।" দেবেন্দ্র অনুমতি করিল, "আসুক।"

উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল যে, সে এক জন অতি দীন-ভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না—কিন্তু অতি দীনা ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প এবং পূর্ব্বলাবণ্যের চিহ্নসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা। তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ, ধূলিধূসরিত—কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।

ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া এরূপ তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য—এ কোন উন্মাদিনী।

উন্মাদিনী অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।"

দেবেন্দ্র তখন চিনিল যে, হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন দশা কে করিল?"

হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধহস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল, "তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু এক দিন আমার খোষামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপর পা রাখিল) গাহিয়াছিলে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

এইরূপ কত কথা মনে করাইয়া দিয়া, উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, "যে দিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া নাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয় দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম—আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না—দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গেল। হীরা তখন নাচিতে নাচিতে ঘরের বাহির হইয়া গায়িতে লাগিল,

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল, "পদপল্লবমুদারং" "পদপল্লবমুদারং"।

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

সমাপ্ত

পাঠভেদ

'বঙ্গদর্শন' প্রথম বৎসরের (১২৭৯) প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ) হইতে 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া চৈত্র মাসে সমাপ্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ইহার আটটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩) "কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত" হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৩। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত পুস্তকের সহিত ইহার পার্থক্য যৎসামান্য। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণ হইতে তাঁহার জীবিতকালের শেষ সংস্করণ পর্য্যন্ত 'বিষবৃক্ষে' সাংঘাতিক কিছু পরিবর্ত্তন করেন নাই—শব্দ ও বাক্যাংশের সাধ্যমত উৎকর্ষ সাধন এবং সামান্য অংশ পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা এই কারণে সকল সংস্করণের পাঠভেদ না দেখাইয়া প্রথম ও অষ্টম সংস্করণের পাঠভেদ নিম্নে প্রদর্শন করিলাম।

'বিষবৃক্ষে'র অন্যান্য সংস্করণগুলির প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা এইরূপঃ ২য়, ১২৮২ (১৮৭৫ ?)—২১৪; ৩য়, ১৮৮০—২১২; ৪র্থ, ১২৮৮ (১৮৮১)—২১২; ষষ্ঠ, ১৮৮৭, ২৪৯; ৭ম, ১৮৯০—২৪৯ ও ৮ম, ১৮৯২—২৪৮। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তক আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরিচ্ছেদ-বিভাগে ১ম ও ৮ম সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য নাই।

পৃ. ৩, পংক্তি ৪, "লইয়া যাইও" কথা দুইটির স্থলে, "লইও" কথাটি ছিল।

৭, "কাজ ছিল" কথা দুইটির স্থলে "মোকদ্দমা মামলার তদ্বির করিতে হইবে" কথাগুলি ছিল।

পৃ. ৩, পংক্তি ১২, "বাতাসে" ও "রৌদ্রে" কথা দুইটি ছিল না।

১৩, "আবর্ত্তে" কথাটি ছিল না।

১৭, "ঘাটে ঘাটে…পচা মাদুর" কথাগুলির স্থলে ছিল—

মাঠে মাঠে কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর লইয়া কৃষকের মহিষীরা

পৃ. ৪, পংক্তি ৭, "আকণ্ঠনিমজ্জিতা" কথাটির স্থলে "আগ্রীব নিমজ্জিতা" ছিল

১৮, "জ্বালা" কথাটির স্থলে "ফুফু" ছিল।

পৃ. ৫, পংক্তি ২, "দাঁড়ীরা" কথাটির স্থলে "মাল্লারা" ছিল।

৬, "আমরা জানি না," কথা কয়টির পূর্ব্বে "ক্ষতি কি" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৬, পংক্তি ১৪, "জীবন-প্রদীপেও" স্থলে "নরদেহেও" ছিল।

পৃ. ৮, পংক্তি ১৬, "আকৃতিবিশিষ্টা" স্থলে "আকৃতি" ছিল।

পৃ. ১০, পংক্তি ৪, "আনুকূল্যে" স্থলে "অর্থানুকূল্যে" ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ৬, "বিশ্বাস করিল" স্থলে "স্বীকৃত হইল" ছিল।

পৃ. ১২, পংক্তি ৪, "মেসো বিনোদ ঘোষের" কথাগুলির স্থলে "মাতৃষ্বস্পতির" ছিল।

পৃ. ১৪, পংক্তি ৯, "আদর।" কথাটির পর ছিল—

কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা সসা, লোকে ভাল বাসে,

পৃ. ১৪, পংক্তি ১৪, "পূরা অধিকার।" কথাগুলির পর ছিল—

কমল যদি আমায় বেদখল করে, আমি বড় দুঃখিত হইব না।

পৃ. ১৪, পংক্তি ২১, "স্বয়ং" কথাটির পর ছিল—

বিবাহ করিবার অভিপ্রায় না করিয়া থাক, তবে সঙ্গে লইয়া আসিও, তুমি আসিলেই বিবাহ দিব। যদি নিজে

পৃ. ১৯, পংক্তি ১৭, "বিগলিতাশ্রুলোচনা" স্থলে "বিগলিতলোচনা" ছিল।

২২, "রাখাল" স্থলে "শ্রীকৃষ্ণ" ও "ঠেঙ্গাইতেছে" স্থলে "ঠেঙ্গাইতেছেন" ছিল।

পৃ. ১৯, পংক্তি ২৩, "তাতে" কথাটির স্থলে "হাতে" ছিল।

পৃ. ২০, পংক্তি ৯, "কুকুর" স্থলে "সকুকুর" ছিল।

১৮, "হাতিশালা" স্থলে "হাতিখানা" ছিল।

২৬, "তপ্তকাঞ্চনবর্ণা" স্থলে "তপ্তকাঞ্চনবর্ণিনী" ছিল।

পৃ. ২১, পংক্তি ৩, "লতার" স্থলে "মাধবীলতার" ছিল।

পৃ. ২৩, পংক্তি ১৩, "তিনগ্রামে সপ্তস্বরে" কথা দুইটির স্থলে "কোমল তীব্র উভয়বিধ স্বরে" ছিল।

পৃ. ২৩, পংক্তি ১৮, "রসিকতার" স্থলে "রস কৌশলের" ছিল।

পৃ. ২৪, পংক্তি ১৯, "ভ্রূযুগ," কথাটির স্থলে "ভ্রূযুক্ত" ছিল।

২২, "টেড়ি কাটা" স্থলে "পেটে পাড়া" ছিল।

পৃ. ২৭, পংক্তি ৪, "অশ্রুতস্বরে" স্থলে "অশ্রাব্যস্বরে" ছিল।

পৃ. ৩১, পংক্তি ২২, "প্রয়োজনীয়" স্থলে "আবশ্যকীয়" ছিল।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ২০, "জামাই বাবুকেও" স্থলে "ঠাকুরজামাইকে" ছিল।

২৪, "জামাই বাবুর" স্থলে "ঠাকুরজামাইয়ের" ছিল।

পৃ. ৩৬, পংক্তি ১২, "আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাঁহার কোন" স্থলে "আমিই ভ্রান্ত। বোধ হয় তাঁহার কোন" এইরূপ ছিল।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ৮, "গেল গেলই।" কথা দুইটির পর ছিল—
আমি আপনার বিষয় রাখিতে পারিলে বাঁচি।

পৃ. ৩৮, পংক্তি ২৪, "না, এ প্রেম" স্থলে "না কিছুই নয়—এ প্রেম" ছিল।

পৃ. ৩৯, পংক্তি ১৫, ১৭, "দাদাবাবুর" কথাটির স্থানে দুই জায়গায় "দাদার" ছিল।

২২-২৩, "থাকিতেও ভাই—...বলিলেন, "তা" কথা কয়টির স্থানে ছিল—
থাকিতেও ভাই তোমার হাত ছাড়া হলো। তা

পৃ. ৪১, পংক্তি ১, "এখন" কথাটির স্থলে "তখন" ছিল।

পৃ. ৪৪, পংক্তি ১৮, "গিন্নী" কথাটির স্থলে "বউ" ছিল।

২০, "দাদাবাবু" স্থলে "দাদা" ছিল।

২৬, "মুখ গম্ভীর হইল।" এই কথাগুলির পর ছিল—
মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল কথা ত নয়। ইটটি মারিলেই পাটকেলটি খেতে হয়। দাদা ইট খেয়েছেন—ছুঁড়ি পাটকেল খেয়ে বসে আছে। আমার শ্রীশচন্দ্র মন্ত্রীবর কাছে নাই—কাহাকেই বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি?"

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২, "আমি তোর দিদি—" কথাগুলির পর ছিল—
আমি তোকে বোনের মত ভাল বাসি—

পৃ. ৪৫, পংক্তি ৬, "দাদাবাবুকে" কথাটির স্থলে "দাদাকে" ছিল।

১২, "না যে—...ঘুরিয়া কুন্দের" কথাগুলির স্থলে ছিল—
না যে দাদা তোকে ভাল বাসে?"

ঘুরিয়া সেই

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২১, "নহিলে নয়।" কথা দুইটির পর ছিল—
চক্ষের আড়াল হইলে, দাদাও ভুলিবে, তুইও ভুলিবি। নহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২৩, "মনে করিয়া দেখ্?—" কথা কয়টির স্থলে ছিল—
মনে করিয়া দেখ্—দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে?"

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২৬-২৭, "নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ,···স্বীকৃত হইল।" এই কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ৭, "সখি কলঙ্কেরি ফুল।" এই কথা কয়টির পর একটি * তারকা-চিহ্ন ছিল এবং পাদটীকায় ছিল—

(*) রাগিণী শঙ্করা-আড় খেমটা।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ২৩, "গিন্নী মশাই" কথা দুইটির স্থলে "ভাই, বউ" ছিল।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ২৩, "দাসীবৃত্তি" স্থলে "দাস্যবৃত্তি" ছিল।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ৪, "জামাই বাবুকে" স্থলে "ঠাকুরজামাইকে" ছিল।

১৩, "শ্বেতপ্রস্তররচিত" কথাটির স্থলে "শ্বেতপ্রস্তররচিতহর্ম্যসংশ্লিষ্ট" ছিল।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ২১, "নিঃশব্দ সরোবরকে শব্দিত" কথা কয়টির স্থলে ছিল—
সরোবরের শব্দহীনতা ভঙ্গ

পৃ. ৫০, পংক্তি ২, "উঠিতেছিল, পড়িতেছিল, ফুটিতেছিল, নিবিতেছিল" কথা কয়টির স্থলে ছিল—
উঠিতেছে, পড়িতেছে, ফুটিতেছে, নিবিতেছে

পৃ. ৫০, পংক্তি ২২, "আলো" কথাটির স্থলে "আ মলো" ছিল।

পৃ. ৫১, পংক্তি ১-২, "কমল কি কথাটি···সে ঐ কথাই।" অংশটুকু ছিল না।

১১, "কে জানে।" কথা দুইটির পূর্ব্বে ছিল—
কমলের মন রাখা কথা—আমায় কেন ভাল বাসিবেন? তা, কমল মন রাখা কথা বলবে কেন?

পৃ. ৫১, পংক্তি ১৫, "সর্ব্বনাশ" কথাটির স্থলে "অসুখী" ছিল।

পৃ. ৫২, পংক্তি ৪ "এই কি সূর্য্যমুখীর" কথা কয়টির স্থলে "এই কি তোমার সূর্য্যমুখীর" ছিল।

পৃ. ৫২, পংক্তি ১৪, "কুন্দ!" কথাটির পর "কালি" ছিল।

২০, "বাঁচিয়া আছি" স্থলে "বাঁচিয়াছিলাম" ছিল।

২১, "মদ খাই" স্থলে "মদ্যপ হইয়াছি" ছিল।

পৃ. ৫৫, পংক্তি ৩, "বৈষ্ণবী-সজ্জা ধরিয়াছি।" কথা কয়টির স্থলে ছিল—,
বৈষ্ণবী সজ্জায় সফল হইয়াছি।

পৃ. ৫৫, পংক্তি ২৬, "তখন পারিষদেরা" হইতে পর-পৃষ্ঠার ১০ম পংক্তির "একবার এক দিকে" অংশটুকুর পরিবর্ত্তে ছিল—

আর একজন কোথা হতে গায়িল ;—

আমার নাম হীরা মালিনী।

মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বা! তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?"

তখন ঠুন! ঠুন! ঝনাত! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালোচুড়ী; গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কাণে ঝুমকা; কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। দেবেন্দ্র প্রেতিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন না। চুপি২ মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবাঃ, কোন্ গাছ থেকে?" আবার

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১২, "পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব—" কথা কয়টির পর "যাও বাপ!" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৩-১৪, "মত্তপ স্ত্রীলোকটিকে···হাতে দিল" কথা কয়টির স্থানে ছিল—

মত্তপ আগতা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে ব্রাণ্ডির গেলাস ধরিল।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৫, "নামাইয়া রাখিল।" কথাগুলির পর ছিল—

এবং মৃদুহাসি হাসিয়া স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ভাল আছ বৈষ্ণবী দিদি?"

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৬, "তখন মাতাল" কথা দুইটির পর ছিল—

বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা! ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত্নী নাকি? এই বলিয়া আবার

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৭, "তাহাকে" কথাটির স্থলে "হীরাকে" ছিল।

২০, "তখন সে···ভাবিয়া বলিল," কথাগুলির স্থলে "হীরা কহিল," ছিল।

পৃ. ৫৭, পংক্তি ১০-১৭, "সে গোপনে উদ্যানমধ্যে···তখন উঠিয়া পলাইল।" কথাগুলির স্থলে ছিল—

মনে২ হীরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জলে হউক, আগুনে হউক, সে অপরিহীন সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে, রাখিয়া উন্মত্ত দেবেন্দ্রের মনের কথা জানিয়া যাইবে। হীরা ভিন্ন এত সাহস আর কাহারও হইত না।

হীরা বলিল, "মনে কোরে আর কি" দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিলে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধর্‌তে এয়েছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

"আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে, কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেল খানাতে রাখ্‌বো তারে দিবারাত্তি॥
মন বাক্স তার লজ্জাতালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলে তালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্সে মেরে নাতি॥

তা, ডাকাতি কর্‌তে গিয়ে থাকি, গিয়াছি বাপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।"

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। Hurrah! কুন্দকলি!—Three Cheers for কুন্দনন্দিনী! বন্দ্যতে মন্দজাতিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-নন্দিনী! বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে কর্‌বে কাল ভ্রমরা—
তবে—ঘেঁটু বনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী। বল বল ত, বল ত কি বলিয়া পাঠিয়েছে? মনে পড়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরীত!

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল;—

"এত দিনের পীরীত, তাহা জানিতেম না। প্রথম পীরীত হলো কেমন কোরে?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরীত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ, শুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন একপাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর।"

দে। তার পর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তার পর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুশ্‌লে এয়েছি, তাতে ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র।—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ! "শিখে রো ছল ভেলা নট নাগর"—তার পর মালিনী মাসি? কি বলিয়া পাঠিয়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃ প্রণাম।

হীরা প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া, হীরা মৃদুহাসি হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল।

পৃ. ৫৭, পংক্তি ২১, গানটির শেষে নিম্নলিখিত দুইটি কলি ছিল—

যেতেছিল বলদ একটা
তেঠেঙ্গো এক ঘোড়ায় চোড়ে।

পৃ. ৫৭, পংক্তি ২৩-২৭, "দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল···হীরার কথা" কথাগুলির স্থলে ছিল—

দেবেন্দ্রের কথিত মত, তাহার সহিত কুন্দনন্দিনীর তিন বৎসর অবধি প্রণয়ের বৃত্তান্ত বিবৃত করিল এবং ইহাও প্রতিপন্ন করিল, যে এক্ষণে দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জার স্বরূপ বৈষ্ণবী বেশে যাতায়াত করিতেছে।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ২, "তোর কে" কথা দুইটির স্থলে "তোমার উপপতি" ছিল।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ৭, "ও মাগী" কথা দুইটির স্থলে "বউ" ছিল।

পৃ. ৬০, পংক্তি ১৪, "চাহিতে লাগিল।" কথা দুইটির পর নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ছিল—

ও সূর্য্যমুখি! রাক্ষসি! ওঠ! দেখ আপনার কীর্ত্তি দেখ! অনাথিনীকে ফেরাও!

পৃ. ৬০, পংক্তি ২০, "বৃষ্টি আসিল।" কথা দুইটির পর "একবসনা" ছিল।

পৃ. ৬০, পংক্তি ২৭, "আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া" কথা কয়টির পূর্ব্বে "মন্দ" কথাটি ছিল।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ৫, "ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।" কথা কয়টির শেষে ছিল—

তুমি বলিয়াছিলে, কুন্দনন্দিনী তোমাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলিয়া যাও নাই। বোধ হয়, আমাকে বিবশ দেখিয়া সে সকল কথা বল নাই। আজি বলিতে পার।"

হি। "কুন্দনন্দিনী কিছুই বলিয়া পাঠান নাই।"

দে। "তবে তুমি কেন আসিয়াছিলে?"

পৃ. ৬৩, পংক্তি ৮, "বুঝিলাম" কথাটির পর ছিল—

কুন্দনন্দিনীর কথা ছল মাত্র।

পৃ. ৬৪, পংক্তি ১, "বিংশ পরিচ্ছেদ"এর স্থলে "বিংশতি পরিচ্ছেদ" ছিল।

পৃ. ৬৪, পংক্তি ১৪, "দেবেন্দ্রের সহিত" কথা দুইটির পর ছিল—

তিন বৎসর পর্য্যন্ত

পৃ. ৬৪, পংক্তি ২৪, "কাজ করিয়া" স্থলে "কাজ সারিয়া" ছিল।

পৃ. ৬৫ পংক্তি ২০, "মনোহরণ" কথাটির স্থলে "পিরীত" ছিল।

২৭, "এক কিল। আহা," কথাগুলির পর ছিল—

এমনই ভাল বাসিতে আরম্ভ করেছি, যে

পৃ. ৬৬, পংক্তি ১, "এ জন্মের" কথা দুইটির স্থলে "ইহজন্মের" ছিল।

৪, "বাসদেবই" কথাটির স্থলে "বাসুদেবই" ছিল।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২, "বিচ্ছেদে বাবুর ভালবাসাটা" কথাগুলির স্থলে ছিল—

বিচ্ছেদে পড়িলেই বাবুর ভালবাসাটা

পৃ. ৭০, পংক্তি ১৪, "কথাটা সত্য কি না ?" কথা কয়টির পর ছিল—

তুমি তারাচরণের কোন্ দিনের ঘরের খবর না জানিতে ? কুন্দের সঙ্গে যে প্রকারে দেবেন্দ্রের যেরূপ তিন বৎসরের আলাপ, তাই কোন্ না শুনিয়াছ ? তবে মাতালের কথায় বিশ্বাস করিলে কেন ?

পৃ. ৭১, পংক্তি ২১, "তোমাকে স্পষ্ট বলিব ;" কথা কয়টির স্থলে ছিল—

তোমাকে স্পষ্ট বলিব না ?

পৃ. ৭১, পংক্তি ২৬, "যন্ত্রণা" কথাটির স্থলে "মৃত্যু যন্ত্রণা" ছিল।

পৃ. ৭৩, পংক্তি ৫, "পুরুষ মানুষ", এবং "কে কার কে"র শেষের "কে" স্থলে দুই জায়গায়ই "উপপতি" ছিল।

পৃ. ৭৩, পংক্তি ১১, "দেখিল," কথাটির স্থলে "দেখিয়া," কথাটি ছিল।

পৃ. ৭৯, পংক্তি ১৬, "ঢোক" কথাটির স্থলে "গ্রাস" ছিল।

২০, "তামাসা" কথাটির স্থলে "রহস্য" ছিল।

২৫, "জন্য" কথাটির স্থলে "বিনিময়ে" ছিল।

পৃ. ৮০, পংক্তি ১, "বাঁদী" কথাটির স্থলে "অধীন" ছিল।

১৬, "বুকে" কথাটি ছিল না।

পৃ. ৮৪, পংক্তি ৩, "যিহুদার" ও পর-পংক্তির "যিহুদী" কথা দুইটির স্থলে দুই জায়গায়ই "মূসার" ছিল।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ১৮, "ঘরের কোণে" কথা দুইটির স্থলে "কক্ষ প্রান্তে" ছিল।

পৃ. ৮৬, পংক্তি ১৪, "ভাইকে" স্থলে "দাদাকে" ছিল।

১৫, "তিনি আজ কত" কথাগুলির স্থলে "তোমার দাদা আজ কত" ছিল।

পৃ. ৮৯, পংক্তি ২৩, "আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম" কথাগুলির স্থলে ছিল—
আবার ছিঁড়িলাম, আবার লিখিলাম

পৃ. ৯০, শেষ পংক্তির "চিত্তসংযমপক্ষে" হইতে পর-পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তির "আবশ্যক।" পর্য্যন্ত অংশটুকু পরিবর্ত্তিত আকারে এইরূপ ছিল—
চিত্ত সংযম পক্ষে আবশ্যক, প্রথমতঃ চিত্তসংযমের প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের সক্ষমতা।

পৃ. ৯১, পংক্তি ২১, "পূর্ব্বগামী দুঃখ" কথা দুইটির পূর্ব্বে "অথচ" কথাটি ছিল।

পৃ. ৯৩, পংক্তি ৭, "অনুসন্ধান" স্থলে "তল্লাস" ছিল।

১৮, "তাও" স্থলে "সত্যি" ছিল।

পৃ. ৯৪, পংক্তি ১, "একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ"এর স্থলে "একত্রিংশ পরিচ্ছেদ" ছিল।

পৃ. ৯৫, পংক্তি ১৬, "সে দিন" স্থলে "যে দিন" ছিল।

পৃ. ৯৬, পংক্তি ১, "দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ"এর স্থলে "দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ" ছিল।

পৃ. ৯৭, পংক্তি ১৪, "সমাকৃষ্ট" স্থলে "সমাকর্ষিত" ছিল।

১৬, "শ্রীমদ্ভাগবতকার" স্থলে "মাদাম্ দেস্তাল্" ছিল।

২৮, "স্নেহ" কথাটির পর ছিল—
সমান হয়। কুরূপ স্বামী বা কুরূপ স্ত্রীর প্রতি স্নেহ

পৃ. ৯৮, পংক্তি ১৭, "থাকিবে না।" কথা দুইটির পর "ইতি।" কথাটি ছিল।

পৃ. ৯৯, পংক্তি ১৫, "বিহঙ্গী" কথাটির স্থলে "বিহঙ্গিনী" ছিল।

২৫, "সতীত্বধর্ম্ম" কথাটির স্থলে "আত্মধর্ম্ম" ছিল।

পৃ. ১০১, পংক্তি ১৪, "উন্মাদকর হইয়াছিল।" কথা দুইটির পর ছিল—
পুষ্পগন্ধে সুরভি বায়ু যেমন উন্মাদকর, প্রকৃতিস্থ কোন সামগ্রীই তদ্রূপ নহে।

পৃ. ১০৪, পংক্তি ৫, "হস্তপ্রসারণ" কথাটির স্থলে "হস্তপ্রচার" ছিল।

পৃ. ১০৬, পংক্তি ১২, "প্রয়োজন" কথাটির স্থলে "আবশ্যক" ছিল।

পৃ. ১০৮, পংক্তি ১১, "ইতি" কথাটির পর "আশীর্ব্বাদ" ছিল।

পৃ. ১০৯, পংক্তি ১৭-১৮, "অনন্তপ্রাসাদশ্রেণী" স্থলে "অনন্তশ্রেণী" ছিল।

১৯, "মুছিলেন" কথাটির স্থলে "মুদিলেন" ছিল।

২৫, "মনে মনে বড় হাসিয়াছিল" কথাগুলির স্থলে ছিল "মনে২ বড় হাসি হাসিয়াছিল"।

পৃ. ১১০, পংক্তি ২১, "এরূপ প্রণয়ীর" স্থলে "এরূপ প্রকৃত প্রণয়ীর" ছিল।

পৃ. ১১৩, পংক্তি ২২, "ভালবাসিতে চাহে?" কথা কয়টির স্থলে ছিল—
সে আপনার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া দগ্ধ করুক। কেন, বিধাতঃ! এ সংসার সুখের কর নাই? তুমি ইচ্ছাময়; ইচ্ছা করিলে সুখের সংসার সৃজিতে পারিতে। সংসারে এত দুঃখ কেন?

পৃ. ১১৪, পংক্তি ৮, "নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল" কথা কয়টির স্থলে "নগেন্দ্রের আজ আশা ফুরাইল" ছিল।

পৃ. ১১৫, পংক্তি ১, "প্রতিবিম্বিত হইলে" স্থলে "প্রতিবিম্বিত হইয়া" ছিল।

পৃ. ১১৬, পংক্তি ৮, "অতিবাহিত করিবেন" স্থলে "অতিবাহিত করিলেন" ছিল।

৯, "এ জীবন" স্থলে "ইহ জীবন" ছিল।

২১, "চক্ষু হস্তে আবৃত" স্থলে "চক্ষে হস্তাবরণ" ছিল।

পৃ. ১১৭, পংক্তি ১৬, "সংবাদ" কথাটির স্থলে "সন্ধান" ছিল।

পৃ. ১১৯, পংক্তি ৯, "অপেক্ষাকৃত আরোগ্য লাভের" স্থলে "প্রায়ারোগ্যলাভের" ছিল।

পৃ. ১২০, পংক্তি ২৮, "কি প্রতিজ্ঞা করিয়া" কথা কয়টির স্থলে ছিল—
প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন রূপে তাহার সন্ধান করিয়া প্রত্যুপকার করিবেন।

পৃ. ১২২, পংক্তি ১৪, "দেখা সাক্ষাতের শেষ দিনে" স্থলে "শেষ সাক্ষাৎ দিবসে," ছিল।

পৃ. ১২২, পংক্তি ২০, "মস্তক স্থির হইল" স্থলে "মস্তক ঘূর্ণন স্থির হইল" ছিল।

পৃ. ১২২-২৩, "চাণ্ডাল" কথাগুলি সর্ব্বত্র "চণ্ডাল" ছিল।

পৃ. ১২৫, পংক্তি ৫, "দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা" স্থলে "দ্বারবানগণ কর্ত্তৃক" ছিল।

পৃ. ১২৬, পংক্তি ২-৩, "ডাক্তার বাবুর বিদ্যাটা ঐ রকম।" কথাগুলি ছিল না।

পৃ. ১২৭, পংক্তি ৪, "ভোজনাবশিষ্ট" স্থলে "উচ্ছিষ্টাবশেষ" ছিল।

পৃ. ১২৭, পংক্তি ১০, "সহিস্‌নীমহলেই" স্থলে "উপপত্নীর গৃহেই" ছিল।

পৃ. ১২৮, পংক্তি ১২, "কাঙ্গালী" স্থলে "কাঙ্গালিনী" ছিল।

পৃ. ১৩২, পংক্তি ১৮-১৯, "উন্নতদেহবিশিষ্টা, পুষ্টকান্তিমতী," কথা দুইটির স্থলে "উন্নতদেহ, পুষ্টকান্তি," ছিল।

পৃ. ১৩৫, পংক্তি ২১, "মাথা তুলিয়া" কথা দুইটির স্থলে "মস্তকোত্তলন করিয়া" ছিল।

পৃ. ১৩৬, পংক্তি ৪, "দেবীই হও" স্থলে "তুমি দেবতাই হও" ছিল।

পৃ. ১৪০, পংক্তি ৪, "বিশ্বাসভাগিনী" ও "অবিশ্বাসভাগিনী" কথা দুইটির স্থলে "বিশ্বাসভাজনী" ও "অবিশ্বাসভাজনী" ছিল।

পৃ. ১৪২, পংক্তি ১১, "সুস্নিগ্ধ" স্থলে "সুগন্ধি" ছিল।

পৃ. ১৪৪, পংক্তি ২৪, "মনের আবেগে" স্থলে "মনের বেগে" ছিল।

পৃ. ১৪৭, পংক্তি ৬, "পরে স্থির হইয়া" স্থলে "কিন্তু সম্বিতা হইয়া" ছিল।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১	২৬	তীক্ষ্ণস্বভাসম্পন্না	তীক্ষ্ণস্বভাবসম্পন্না
৯৩	২৪	হাওয়া	যাওয়া

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

ইন্দিরা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩৷১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা

পৌষ, ১৩৪১

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী হইতে হইয়াছিল। সে যুগে লেখকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। 'বঙ্গদর্শনে'র মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রের লেখক যেমন তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছে, সাময়িক-পত্রের উপযোগী বিভিন্ন ধরণের লেখার আদর্শও তাঁহাকে নিজেই গড়িয়া লইতে হইয়াছিল। এই আদর্শ-প্রস্তুতের পরীক্ষায় বাংলা-সাহিত্য 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ সমালোচন', 'প্রবন্ধ-পুস্তক' প্রভৃতি বিচিত্র রচনাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। 'ইন্দিরা'ও 'বঙ্গদর্শনে'র বৈচিত্র্য-সম্পাদনে রচিত হইয়াছিল। ইহাকে বাংলা-সাহিত্যে ছোট-গল্প রচনার পরীক্ষার প্রথম ফল বলা যাইতে পারে।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ প্রথম বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র সংখ্যায় 'ইন্দিরা' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব-বৎসর পর্য্যন্ত ইহা ছোট-গল্প আকারেই প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্দিরা' বৃদ্ধি পাইয়া উপন্যাসের আকার গ্রহণ করে। ইহাই 'ইন্দিরা'র পঞ্চম বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ। এই সংস্করণের পাঠই মূল পাঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

'ইন্দিরা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮০ বঙ্গাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৫। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল—

> ইন্দিরা। / উপন্যাস। / বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। / কাঁটালপাড়া। / বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, / কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ১২৮০। / মূল্য চারি আনা মাত্র। /

প্রথম সংস্করণ ও পঞ্চম সংস্করণের পরিবর্ত্তন বুঝাইবার জন্য আমরা বর্ত্তমান সংস্করণের শেষে প্রথম সংস্করণ হুবহু পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। সুতরাং পাঠভেদ দেওয়া হয় নাই। 'ইন্দিরা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের স্বতন্ত্র পুস্তক আমরা দেখি নাই। অনুমান হয়, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'উপকথা' পুস্তকে মুদ্রিত 'ইন্দিরা'কে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'উপকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত 'ইন্দিরা'কে তৃতীয় সংস্করণ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। এই অনুমানের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

উপন্যাস' পুস্তকে 'ইন্দিরা'র ৪র্থ সংস্করণও (পৃ. ৪৫) যোজিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭৭।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন-অনূদিত *Indira and other Stories* প্রকাশিত হয়। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর হইতে কানাড়ী ভাষায় 'ইন্দিরা'র অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ করেন—বি. বেঙ্কটাচার্য্য।

ইন্দিরা

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চম সংস্করণ হইতে]

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন

ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে। ইহা যদি কেহ অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তবে ইন্দিরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে পারে যে, এমন অনেক ছোটই বড় হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছায় নিত্যই ছোট, বড় হইতেছে। রাজার কাজ ত এই দেখি, ছোটকে বড় করিয়া, বড়কে ছোট করেন। সমাজও দেখিতে পাই বড়কে ছোট, ছোটকে বড় করেন। আমিও যাহার অধীন, সে না হয়, আমাকে ছোট দেখিয়া, বড় করিল। তার আর কৈফিয়ৎ কি দিব?

তবে দোষের কথাটা এই যে, বড় হইলে দর বাড়ে। রাজার কৃপায় বা সমাজের কৃপায় যাঁহারা বড় হয়েন, তাঁহারা বড় হইলেও আপনার আপনার দর বাড়াইয়া বসেন। এমন কি পুলিসের জমাদার যিনি এক টাকা ঘুষেই সন্তুষ্ট, দারোগা হইলেই তিনি দুই টাকা চাহিয়া বসেন, কেন না, বড় হইয়া তাঁহার দর বাড়িয়াছে। গরীব ইন্দিরা বলিতে পারে, আমি হঠাৎ বড় হইলাম, আমার কেন দর বাড়িবে না?

তবে, ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট, ছোট থাকিলেই ভাল। ছোট লোক বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে? কিন্তু অনেক ছোট লোকেই তাহা স্বীকার করিবে না। ইন্দিরা কেন তাহা স্বীকার করিবে?

পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবর বৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে, আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, পুরাতন নামে এ একখানা নূতন গ্রন্থ। নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রন্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই।

Rarely, rarely, comest thou,
Spirit of Delight!
Wherefore hast thou left me now
Many a day and night?
Many a weary night and day!
'Tis since thou art fled away.

How shall ever one like me
Win thee back again?
With the joyous and the free
Thou wilt scoff at pain.
Spirit false! thou hast forgot
All but those who need thee not.

*　*　*　*

Let me set my mournful ditty
To a merry measure;—
Thou wilt never come for pity,
Thou wilt come for pleasure.

*　*　*　*

Thou art love and life! O come!
Make once more my heart thy home!

Shelley.

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না; বলিলেন, "বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?" শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জ্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সংবাদ লইলেন না। রাগে আমার শরীর গর গর করিত। কত টাকা চাই? পিতা মাতার উপর বড় রাগ হইত—কেন পোড়া টাকা উপার্জ্জনের কথা তাঁহারা তুলিয়াছিলেন? টাকা কি আমার সুখের চেয়ে বড়! আমার বাপের ঘরে অনেক টাকা—আমি টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলিতাম। মনে মনে করিতাম, একদিন টাকা পাতিয়া শুইয়া দেখিব—কি সুখ? একদিন মাকে বলিলাম, "মা, টাকা পাতিয়া শুইব।" মা বলিলেন, "পাগলী কোথাকার!" মা কথাটা বুঝিলেন। কি কল কৌশল করিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট্ বটে ত?) কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জ্জনা করিবেন, হাল আইনে তাঁহাকে "আমার উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কী

বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মানুষ বটে। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারি জন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

মনে মনে বাবার কথার উত্তর দিলাম। বলিলাম, আমার প্রাণটা বুঝি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল; তুমি যেন বুঝিতে পারিয়া হাসিও না।"

আমার ছোট বহিন কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল;—বলিল, "দিদি! আবার আসিবে কবে?" আমি তাহার গাল টিপিয়া ধরিলাম।

কামিনী বলিল, "দিদি, শ্বশুরবাড়ী কেমন, তাহা কিছু জানিস না?"

আমি বলিলাম, "জানি। সে নন্দন-বন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র উঠে।"

কামিনী হাসিয়া বলিল, "মরণ আর কি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী চলিলাম

ভগিনীর এই আশীর্ব্বাদ লইয়া আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুর-বাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে, জানিতাম।

তাই চক্ষে একটু একটু জল আসিয়াছিল। রাত্রিতে আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইব না, তিনি কেমন। রাত্রিতে ত তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন না, আমি কেমন। মা বহু যত্নে চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—দশ ক্রোশ পথ যাইতে যাইতে খোপা খসিয়া যাইবে, চুল সব স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। পাল্কীর ভিতর ঘামিয়া বিশ্রী হইয়া যাইব। তৃষ্ণায় মুখের তাম্বুলরাগ শুকাইয়া উঠিবে, শ্রান্তিতে শরীর হতশ্রী হইয়া যাইবে। তোমরা হাসিতেছ? আমার মাথার দিব্য হাসিও না, আমি ভরা যৌবনে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। পাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই জন্য লোকে "ডাকাতে কালা দীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান্, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পৌছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, "আমরা কিছু জল-টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?" আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায়, কেবল ঠাকুর দেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পৌছি—কোথায় বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। কিন্তু ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে। আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরা যৌবনে স্বামিসন্দর্শনে—তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক্ ভরা যৌবনে!

এই ভাবিতে ভাবিতে আমি ক্ষণেক পরে, অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাৎ গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারি পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণশোভিত "পাহাড়,"—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষশ্রেণী ; পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজপুষ্পপত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর নীলিমা! কি সুন্দর শ্বেতমেঘের স্তর পরম্পরের মূর্ত্তিবৈচিত্র্য—কিবা নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষী সকলের নীলিমামধ্যে বিকীর্ণ কৃষ্ণবিন্দুনিচয়তুল্য শোভা! মনে মনে হইল, এমন কোন বিদ্যা নাই কি, যাতে মানুষ পাখী হইতে পারে? পাখী হইতে পারিলে আমি এখনই উড়িয়া চিরবাঞ্ছিতের নিকট পৌঁছিতাম।

আবার সরোবর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম—এবার একটু ভীত হইলাম, দেখিলাম যে, বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক—এক জন শ্বশুরবাড়ীর, এক জন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরুপদার্থ পড়িল। আমি সে দিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য। ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম ; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, এ সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপ চারি জন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে! কোন্ হ্যায় রে!" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে? পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িয়া পলাইব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাল্কীর পিছনে দৌড়াইল। অতএব ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে গাছের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান্ অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল, তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম, যেখানে নামাইল, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নইলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই—তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়, সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে বন্য-পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম,

"তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহনীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণভাবে বলিল, "বাছা, অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরৎ হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

একজন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না।—এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দ্দার। সে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়িতে এইখানেই তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?" তাহারা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ

এমনও কি কখনও হয়? এত বিপদ, এত দুঃখ কাহারও কখনও ঘটিয়াছে? কোথায় প্রথম স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছিলাম—সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার পরিয়া, কত সাধে চুল বাঁধিয়া, সাধের সাজা পানে অকলুষিত ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিয়া, সুগন্ধে এই কৌমারপ্রফুল্ল দেহ আমোদিত করিয়া এই উনিশ বৎসর লইয়া, প্রথম স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছিলাম, কি বলিয়া এই অমূল্যরত্ন তাঁহার পাদপদ্মে উপহার দিব, তাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম;—অকস্মাৎ তাহাতে একি বজ্রাঘাত! সর্ব্বালঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে,—লউক; জীর্ণ মলিন দুর্গন্ধ বস্ত্র পরাইয়াছে,—পরাক্; বাঘ-ভালুকের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে,—যাক্; ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে,—তা যাক্—প্রাণ আর চাহি না, এখন গেলেই ভাল; কিন্তু যদি প্রাণ না যায়, যদি বাঁচি, তবে কোথায় যাইব? আর ত তাঁকে দেখা হইল না—বাপ মাকেও বুঝি দেখিতে পাইব না। কাঁদিলে ত কান্না ফুরায় না।

তাই কাঁদিব না বলিয়া স্থির করিতেছিলাম। চক্ষুর জল কিছুতেই থামিতেছিল না, তবু চেষ্টা করিতেছিলাম—এমন সময়ে দূরে কি একটা বিকট গর্জ্জন হইল। মনে করিলাম, বাঘ। মনে একটু আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। হাড় গোড়

ভাঙ্গিয়া, রক্ত শুষিয়া খাইবে, ভাবিলাম, তাও সহ্য করিব ; শরীরের কষ্ট বৈ ত না। মরিতে পাইব, সেই পরম সুখ। অতএব কান্না বন্ধ করিয়া, একটু প্রফুল্ল হইয়া, স্থিরভাবে রহিলাম, বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পাতার যত বার ঘস্ ঘস্ শব্দ হয়, তত বার মনে করি, ঐ সর্ব্বদুঃখহর প্রাণস্নিগ্ধকর বাঘ আসিতেছে। কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ হইলাম। তখন মনে হইল—যেখানে বড় ঝোপ জঙ্গল, সেইখানে সাপ থাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম, তাহার ভিতরে কত বেড়াইলাম। হায়! মনুষ্য দেখিলে সকলেই পলায়—বনমধ্যে কত সর্ সর্ ঝট্ পট্ শব্দ শুনিলাম, কিন্তু সাপের ঘাড়ে ত পা পড়িল না ; আমার পায়ে অনেক কাঁটা ফুটিল, অনেক বিছুটি লাগিল, কিন্তু কৈ ? সাপে ত কামড়াইল না। আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়াছিলাম—আর বেড়াইতে পারিলাম না। একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়া বসিলাম। সহসা সম্মুখে এক ভল্লুক উপস্থিত হইল—মনে করিলাম, ভালুকের হাতেই মরিব। ভালুকটাকে তাড়া করিয়া মারিতে গেলাম। কিন্তু হায়! ভালুকটা আমায় কিছু বলিল না। সে গিয়া এক বৃক্ষের উপর উঠিল। বৃক্ষের উপর হইতে কিছু পরে ঝন্ করিয়া সহস্র মক্ষিকার শব্দ হইল। বুঝিলাম, এই বৃক্ষে মৌচাক আছে, ভালুক জানিত ; মধু লুটিবার লোভে আমাকে ত্যাগ করিল।

শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিল—বসিয়া বসিয়া গাছে হেলান দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন যাই কোথায় ?

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে—বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমুক্তায় সাজাইয়াছে। আলোতে প্রথমেই দেখিলাম, আমার হাতে কিছু নাই, দস্যুরা প্রকোষ্ঠালঙ্কার সকল কাড়িয়া লইয়া বিধবা সাজাইয়াছে। বাঁ হাতে এক টুক্‌রা লোহা আছে—কিন্তু দাহিন হাতে কিছু নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে বাঁধিলাম।

তার পর চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলাম যে, আমি যেখানে বসিয়া ছিলাম, তাহার নিকট অনেকগুলি গাছের ডাল কাটা ; কোন গাছ সমূলে ছিন্ন,

কেবল শিকড় পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, এখানে কাঠুরিয়ারা আসিয়া থাকে। তবে গ্রামে যাইবার পথ আছে। দিবার আলোক দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—আবার আশার উদয় হইয়াছিল ;—উনিশ বৎসর বৈ ত বয়স নয়! সন্ধান করিতে করিতে একটা অতি অস্পষ্ট পথের রেখা দেখিতে পাইলাম। তাই ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে পথের রেখা আরও স্পষ্ট হইল। ভরসা হইল গ্রাম পাইব।

তখন আর এক বিপদ মনে হইল—গ্রামে যাওয়া হইবে না। যে ছেঁড়া মুড়া কাপড়টুকু ডাকাইতেরা আমাকে পরাইয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন মতে কোমর হইতে আঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে—আমার বুকে কাপড় নাই। কেমন করিয়া লোকালয়ে কালামুখ দেখাইব? যাওয়া হইবে না—এইখানে মরিতে হইবে। ইহাই স্থির করিলাম।

কিন্তু পৃথিবীকে রবিরশ্মিপ্রভাসিত দেখিয়া, পক্ষিগণের কলকূজন শুনিয়া, লতায় লতায় পুষ্পরাশি দুলিতে দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তখন গাছ হইতে কতকগুলা পাতা ছিঁড়িয়া ছোটা দিয়া গাঁথিয়া, তাহা কোমরে ও গলায় ছোটা দিয়া বাঁধিলাম। এক রকম লজ্জা নিবারণ হইল, কিন্তু পাগলের মত দেখাইতে লাগিল। তখন সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে গরুর ডাক শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, গ্রাম নিকট।

কিন্তু আর ত চলিতে পারি না। কখনও চলা অভ্যাস নাই। তার পর সমস্ত রাত্রি জাগরণ, রাত্রির সেই অসহ্য মানসিক ও শারীরিক কষ্ট; ক্ষুধা তৃষ্ণা। আমি অবসন্ন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলাম। শুইবা মাত্র নিদ্রাভিভূত হইলাম।

নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম যে, মেঘের উপর বসিয়া ইন্দ্রালয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছি। স্বয়ং রতিপতি যেন আমার স্বামী—রতিদেবী আমার সপত্নী—পারিজাত লইয়া তাহার সঙ্গে কোন্দল করিতেছি। এমন সময়ে কাহারও স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম, এক জন যুবা পুরুষ, দেখিয়া বোধ হইল, ইতর অন্ত্যজ জাতীয়, কুলী মজুরের মত, আমার হাত ধরিয়া টানিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে একখানা কাঠ সেখানে পড়িয়াছিল। তাহা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া সেই পাপিষ্ঠের মাথায় মারিলাম। কোথায় জোর পাইলাম জানি না, সে ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

কাঠখানা আর ফেলিলাম না; তাহার উপর ভর করিয়া চলিলাম। অনেক পথ হাঁটিয়া, এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে একটা গাই তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহেশপুর কোথায় ? মনোহরপুরই বা কোথায় ? প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে ? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে ? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা। তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া গাইটি দুইয়া একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস। তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে ? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথ হাঁটিলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর ?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সেই গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ, বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে এক দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে ?" সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে ?"

আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি ?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।"

ছাই রূপ! ঐ রূপ, রূপ শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। এই দয়ালু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাজক, পৌরোহিত্য করেন। আমার বস্ত্রের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কাপড়ের এমন দশা কেন ? তোমার কাপড় কি

কেহ কাড়িয়া লইয়াছে?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।" তিনি যজমানদিগের নিকট অনেক কাপড় পাইতেন—দুইখানা খাটো বহরের চৌড়া রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী আমাকে পরিতে দিলেন। শাকার কড়ও তাঁর ঘরে ছিল, তাহাও চাহিয়া লইয়া পরিলাম।

এ সকল কার্য্য সমাধা করিলাম—অতি কষ্টে। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী দুটি ভাত দিলেন—খাইলাম। একটা মাদুর দিলেন, পাতিয়া শুইলাম। কিন্তু এত কষ্টেও ঘুমাইলাম না। আমি যে জন্মের মত গিয়াছি—আমার যে মরাই ভাল ছিল, কেবল তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। ঘুম হইল না।

প্রভাতে একটু ঘুম আসিল। আবার একটা স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, সম্মুখে অন্ধকারময় যমমূর্ত্তি, বিকট দংষ্ট্রারাশি প্রকটিত করিয়া হাসিতেছে। আর ঘুমাইলাম না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত গা বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে, বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গায়ের বেদনা আরাম হইল, তত দিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল।" ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না। উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্রসন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথাও পাঠাইতে পারি না।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

এক দিন শুনিলাম যে, ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক এক জন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে, কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয় আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবু আমার যজমান। সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।"

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা, বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথা আপন পিত্রালয়ে পঁহুছিতে পারে।" কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে, বসু মহাশয়ের পরিবার কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াও, কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন, চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পরদিন নৌকায় উঠিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাজিয়ে যাব মল

আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্ত্ত জন্য সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়! তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি—যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রকমের কত নৌকা; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়ি মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল; কত রকমের লোক, কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথাও সাদা মেঘের মত অসীম সৈকত ভূমি—তাতে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয় দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।

যে দিন কলিকাতায় পৌঁছিব, তাহার পূর্ব্বদিন, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জোয়ার আসিল। নৌকা আর গেল না। একখানা ভদ্র গ্রামের একটা বাঁধা ঘাটের নিকট আমাদের নৌকা লাগাইয়া রাখিল। কত সুন্দর জিনিস দেখিলাম; জেলেরা মোচার খোলার মত ডিঙ্গীতে মাছ ধরিতেছে, দেখিলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘাটের রাণায় বসিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন, দেখিলাম। কত সুন্দরী, বেশভূষা করিয়া জল লইতে আসিল। কেহ জল ফেলে, কেহ কলসী পুরে, কেহ আবার ঢালে, আবার পুরে, আর হাসে, গল্প করে, আবার ফেলে, আবার কলসী ভরে। দেখিয়া আমার প্রাচীন গীতটি মনে পড়িল,

একা কাঁকে কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায়!

কলসীতে দিতে ঢেউ, আর না দেখিলাম কেউ,
পুন কানু জলেতে লুকায়।

সেই দিন সেইখানে দুইটি মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের কখন ভুলিব না। মেয়ে দুইটির বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়াছিল ভাল। কানে দুল, হাতে আর গলায় এক একখানা গহনা। ফুল দিয়া খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ্ করা, শিউলীফুলে ছোবান, দুইখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারি গাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট দুইটি কলসী আছে। তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান গায়িতে গায়িতে নামিল। গানটি মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল, তাই এখানে লিখিলাম। এক জন এক এক পদ গায়, আর এক জন দ্বিতীয় পদ গায়। তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্ম্মলা। প্রথমে গায়িল,—

অমলা

ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে,
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

নির্ম্মলা

ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

অমলা

বিনোদ বেশে মুচ্‌কে হেসে,
খুলব হাসির কল।
কলসী ধ'রে, গরব ক'রে
বাজিয়ে যাব মল।

আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

নির্ম্মলা

গহনা গায়ে, আল্‌তা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

অমলা

যত ছেলে, খেলা ফেলে,
ফিরচে দলে দল।
কত বুড়ী, জুজুবুড়ী
ধরবে কত জল,
আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা বাজিয়ে যাব মল,
সই বাজিয়ে যাব মল ॥

দুই জনে

আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল।

বালিকাসিঞ্চিতরসে, এ জীবন কিছু শীতল হইল। আমি মনোযোগপূর্ব্বক এই গান শুনিতেছি, দেখিয়া বসুজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ছাই গান আবার হাঁ করিয়া শুনচ কেন?" আমি বলিলাম, "ক্ষতি কি?"

বসুজপত্নী। ছুঁড়ীদের মরণ আর কি? মল বাজানর আবার গান।

আমি। ষোল বছরের মেয়ের মুখে ভাল শুনাইত না বটে, সাত বছরের মেয়ের মুখে বেশ শুনায়। জোয়ান মিন্‌ষের হাতের চড় চাপড় জিনিস ভাল নহে বটে, কিন্তু তিন বছরের ছেলের হাতের চড় চাপড় বড় মিষ্ট।

বসুজপত্নী আর কিছু না বলিয়া, ভারি হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এ প্রভেদ কেন হয়? এক জিনিস দুই রকম লাগে কেন? যে দান দরিদ্রকে দিলে পুণ্য হয়, তাহা বড়মানুষকে দিলে খোষামোদ বলিয়া গণ্য হয় কেন? যে সত্য ধর্ম্মের প্রধান, অবস্থাবিশেষ তাহা আত্মশ্লাঘা বা পরনিন্দাপাপ হয় কেন? যে ক্ষমা পরমধর্ম্ম, দুষ্কৃতকারীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে, তাহা মহাপাপ কেন? সত্য সত্যই কেহ স্ত্রীকে বনে দিয়া আসিলে লোকে তাহাকে মহাপাপী বলে; কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে বনে দিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ মহাপাপী বলে না কেন?

ঠিক করিলাম, অবস্থাভেদে এ সকল হয়। কথাটা আমার মনে রহিল। আমি ইহার পর এক দিন যে নির্লজ্জ কাজের কথা বলিব, তাহা এই কথা মনে করিয়া করিয়াছিলাম। তাই এ গানটা এখানে লিখিলাম।

নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া, বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র;—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞান বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য, অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে? * নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তীরবর্ত্তী রাজপথে গাড়ি পাল্কী পিপ্‌ড়ের সারির মত চলিয়াছে—যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যার ত কথাই নাই। তখন মনে হইল, ইহার ভিতর খুড়াকে খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে? নদীসৈকতের বালুকারাশির ভিতর হইতে, চেনা বালুকাকণাটি খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে?

---

* কলিকাতায় এক্ষণে নৌকার সংখ্যা পূর্ব্বকার শতাংশও নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবো

কৃষ্ণদাস বাবু কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতায় কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না—আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনই একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। এক জন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় এক জন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে?

কৃষ্ণদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার পত্নী কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। এখন কাহারও বাড়ীতে দাসীপনা কর। আজ সুবী আসিবার কথা আছে, তাকে বলিয়া দিব, বাড়ীতে তোমায় চাকরাণী রাখিবে।"

আমি শুনিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। "শেষ কি কপালে দাসীপনা ছিল!" আমার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। কৃষ্ণদাস বাবুর দয়া হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি কি করিব?" সে কথা সত্য;—তিনি কি করিবেন? আমার কপাল!

আমি একটা ঘরের ভিতর গিয়া একটা কোণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস বাবুর গিন্নী আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির হইয়া তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন, "এই সুবো এয়েছে। তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, তবে বলিয়া দিই।"

ঝি থাকিব না, না খাইয়া মরিব, সে কথা ত স্থির করিয়াছি;—কিন্তু এখনকার সে কথা নহে—এখন একবার সুবোকে দেখিয়া লইলাম। "সুবো" শুনিয়া আমি ভাবিয়া

রাখিয়াছিলাম যে "সাহেব সুবো" দরের একটা কি জিনিস—আমি তখন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। দেখিলাম, তা নয়—একটি স্ত্রীলোক—দেখিবার মত সামগ্রী। অনেক দিন এমন ভাল সামগ্রী কিছু দেখি নাই। মানুষটি আমারই বয়সী হইবে। রঙ্ আমা অপেক্ষা যে ফরসা তাও নয়। বেশভূষা এমন কিছু নয়, কানে গোটাকতক মাকড়ি, হাতে বালা, গলায় চীক, একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরা। তাতেই দেখিবার সামগ্রী। এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে—চারিদিক্ হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেরিয়াছে। খুব বড় বড় চোখ—কখন স্থির, কখন হাসিতেছে। ঠোঁট দুইখানি পাতলা রাঙ্গা টুকটুকে ফুলের পাপড়ির মত উল্টান, মুখখানি ছোট, সবশুদ্ধ যেন একটি ফুটন্ত ফুল। গড়ন পিটন কি রকম, তাহা ধরিতে পারিলাম না। আমগাছের যে ডাল কচিয়া যায়, সে ডাল যেমন বাতাসে খেলে, সেই রকম তাহার সর্ব্বাঙ্গ খেলিতে লাগিল—যেমন নদীতে ঢেউ খেলে, তাহার শরীরে তেমনই কি একটা খেলিতে লাগিল—আমি কিছু ধরিতে পারিলাম না, তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল। পাঠককে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না যে, আমি পুরুষ মানুষ নহি—মেয়ে মানুষ—নিজেও এক দিন একটু সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা ছিলাম। সুবোর সঙ্গে একটি তিন বছরের ছেলে—সেটিও তেমনি একটি আধফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।

আমি অনিমেষলোচনে সুবোকে ও তার ছেলেকে দেখিতেছি দেখিয়া, কৃষ্ণদাস বাবুর গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কথার উত্তর দাও না যে—ভাব কি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি কে ?"

গৃহিণী ঠাকুরাণী ধমকাইয়া বলিলেন, "তাও কি বলিয়া দিতে হইবে ? ও সুবো, আর কে ?"

তখন সুবো একটু হাসিয়া বলিল, "তা মাসীমা, একটু বলিয়া দিতে হয়, বৈ কি ? উনি নূতন লোক, আমায় ত চেনেন না।" এই বলিয়া সুবো আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম সুভাষিণী গো—ইনি আমার মাসীমা, আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।"

তার পর কথার সূত্রটা গৃহিণী নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "কলিকাতার রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। তারা বড় মানুষ। ছেলেবেলা

থেকে ও শ্বশুরবাড়ীই থাকে—আমরা কখন দেখিতে পাই না। আমি কালীঘাটে এসেছি শুনে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছে। ওরা বড় মানুষ। বড় মানুষের বাড়ী তুমি কাজকর্ম্ম করিতে পারিবে ত?"

আমি হরমোহন দত্তের মেয়ে, টাকার গদিতে শুইতে চাহিয়াছিলাম—আমি বড় মানুষের বাড়ী কাজ করিতে পারিব ত? আমার চোখে জলও আসিল; মুখে হাসিও আসিল।

তাহা আর কেহ দেখিল না—সুভাষিণী দেখিল। গৃহিণীকে বলিল, "আমি একটু আড়ালে সে সকল কথা ওঁকে বলি গে। যদি উনি রাজি হন, তবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া একটা ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে কেহ ছিল না। কেবল ছেলেটি মার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া গেল। একখানা তক্তপোষ পাতা ছিল। সুভাষিণী তাহাতে বসিল—আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বলিল, "আমার নাম না জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি। তোমার নাম কি ভাই?"

"ভাই!" যদি দাসীপনা করিতে পারি, তবে ইহার কাছে পারি, মনে মনে ইহা ভাবিয়াই ইহার উত্তর করিলাম, "আমার দুইটি নাম—একটি চলিত, একটি অপ্রচলিত। যেটি অপ্রচলিত, তাহাই ইহাদিগকে বলিয়াছি; কাজেই আপনার কাছে এখন তাহাই বলিব। আমার নাম কুমুদিনী।"

ছেলে বলিল, "কুমুডিনী।"

সুভাষিণী বলিল, "আর নাম এখন নাই শুনিলাম, জাতি কায়স্থ বটে?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমরা কায়স্থ।"

সুভাষিণী বলিল, "কার মেয়ে, কার বউ, কোথায় বাড়ী, তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। এখন যাহা বলিব, তাহা শুন। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি—তোমার হাতে গলায়, গহনার কালি আজিও রহিয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিতে বলিব না—তুমি কিছু কিছু রাঁধিতে জান না কি?"

আমি বলিলাম, "জানি। রান্নায় আমি পিত্রালয়ে যশস্বিনী ছিলাম।"

সুভাষিণী বলিল, "আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। (মাঝখান থেকে ছেলে বলিল, "মা, আমি দাঁদি") তবু, কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে। সে মাগীটা বাড়ী যাইবে। (ছেলে বলিল, "ত মা বালী দাই") এখন মাকে বলিয়া তোমাকে

তার জায়গায় রাখাইয়া দিব। তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলেই রাঁধিব, তারই সঙ্গে তুমি দুই এক দিন রাঁধিবে। কেমন রাজি ?"

ছেলে বলিল, "আজি ? ও আজি ?"

মা বলিল, "তুই পাজি।"

ছেলে বলিল, "আমি বাবু, বাবা পাজি।"

"অমন কথা বলতে নেই বাবা!" এই কথা ছেলেকে বলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া সুভাষিণী বলিল, "নিত্যই বলে।" আমি বলিলাম, "আপনার কাছে আমি দাসীপনা করিতেও রাজি।"

"আপনি কেন বল ভাই ? বল ত মাকে বলিও। সেই মাকে লইয়া একটু গোল আছে। তিনি একটু খিট্‌খিটে—তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে। তা তুমি পারিবে—আমি মানুষ চিনি। কেমন রাজি ?"

আমি বলিলাম, "রাজি না হইয়া কি করি ? আমার আর উপায় নাই।" আমার চক্ষুতে আবার জল আসিল।

সে বলিল, "উপায় নাই কেন ? রও ভাই, আমি আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আসিতেছি।"

সুভাষিণী ভোঁ করিয়া ছুটিয়া মাসীর কাছে গেল—বলিল, "হাঁ গা, ইনি তোমাদের কে গা ?"

ঐটুকু পর্য্যন্ত আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর মাসী কি বলিলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। বোধ হয়, তিনি যতটুকু জানিতেন, তাহাই বলিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি কিছুই জানিতেন না; পুরোহিতের কাছে যতটুকু শুনিয়াছিলেন, ততটুকু পর্য্যন্ত। ছেলেটি এবার মার সঙ্গে যায় নাই—আমার হাত লইয়া খেলা করিতেছিল। আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। সুভাষিণী ফিরিয়া আসিল।

ছেলে বলিল, "মা, আঙ্গা হাত দেখ্।"

সুভাষিণী হাসিয়া বলিল, "আমি তা অনেকক্ষণ দেখিয়াছি।" আমাকে বলিল, "চল গাড়ি তৈয়ার। না যাও, আমি ধরিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু যে কথাটা বলিয়াছি—মাকে বশ করিতে হইবে।"

সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া গাড়িতে তুলিল। পুরোহিত মহাশয়ের দেওয়া রাঙ্গাপেড়ে কাপড় দুইখানির মধ্যে একখানি আমি পরিয়াছিলাম—আর একখানি

দড়িতে শুকাইতেছিল—তাহা লইয়া যাইতে সময় দিল না। তাহার পরিবর্তে আমি সুভাষিণীর পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে চলিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালির বোতল

মা—সুভাষিণীর শাশুড়ী। তাঁহাকে বশ করিতে হইবে—সুতরাং গিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলাম, তার পর এক নজর দেখিয়া লইলাম, মানুষটা কি রকম। তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে, একটা পাটী পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লম্বা কালির বোতল গলায় গলায় কালি ভরা, পাটীর উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি বোতলটির টিনের ঢাকনির* মত শোভা পাইতেছে। অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?"

বধূ বলিল, "তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়া এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেলে?

বধূ। মাসীমা দিয়াছেন।

গৃ। বামন না কায়েৎ?

ব। কায়েৎ।

গৃ। আঃ, তোমার মাসীমার পোড়া কপাল। কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? এক দিন বামনকে ভাত দিতে হলে কি দিব?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না—যে কয় দিন চলে চলুক—তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামনের মেয়ের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেন—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন। কেন, আমরা কি মুচি?

আমি মনে মনে সুভাষিণীকে ভূয়সী প্রশংসা করিলাম—কালিভরা লম্বা বোতলটাকে সে মুঠোর ভিতর আনিতে জানে দেখিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্যি বটে মা—

---

* Capsule.

ছোট লোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিন কতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি। মাইনে কত বলেছে ?

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। হায় রে, কলিকালের মেয়ে! লোক রাখতে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কও নাই ?

আমাকে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে তুমি ?"

আমি বলিলাম, "যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এয়েছি, তখন যা দিবেন তাই নিব।"

গৃ। তা বামনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয় বটে, কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে—তোমায় তিন টাকা মাসে আর খোরাক পোষাক দিব।

আমার একটু আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট—সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, মাহিয়ানা লইতে হইবে শুনিয়াই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "তাই দিবেন।"

মনে করিলাম, গোল মিটিল—কিন্তু তাহা নহে। লম্বা বোতলটায় কালি অনেক। তিনি বলিলেন, "তোমার বয়স কি গা ? অন্ধকারে বয়স ঠাওর পাইতেছি না—কিন্তু গলাটা ছেলেমানুষের মত বোধ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "বয়স এই উনিশ কুড়ি।"

গৃহিণী। তবে বাছা, অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখ গিয়া যাও। আমি সমত্ত লোক রাখি না।

সুভাষিণী মাঝে হইতে বলিল, "কেন মা, সমত্ত লোকে কি কাজ কর্ম্ম পারে না ?"

গৃ। দূর বেটী পাগলের মেয়ে। সমত্ত লোক কি লোক ভাল হয় ?

সু। সে কি মা! দেশশুদ্ধ সব সমত্ত লোক কি মন্দ ?

গৃ। তা নাই হলো—তবে ছোট লোক যারা খেটে খায় তারা কি ভাল ?

এবার কান্না রাখিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া উঠিয়া গেলাম। কালির বোতলটা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুঁড়ী চললো না কি ?"

সুভাষিণী বলিল, "বোধ হয়।"

গৃ। তা যাক গে।

সু। কিন্তু গৃহস্থ বাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে ? উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিদায় করিতেছি।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার পিছু পিছু উঠিয়া আসিল। আমাকে ধরিয়া আপনার শয়নগৃহে লইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আর আমায় ধরিয়া রাখিতেছ কেন? পেটের দায়ে, কি প্রাণের দায়ে, আমি এমন সব কথা শুনিবার জন্য থাকিতে পারিব না।"

সুভাষিণী বলিল, "থাকিয়া কাজ নাই। কিন্তু আমার অনুরোধে আজিকার রাত্রিটা থাক।"

কোথায় যাইব? কাজেই চক্ষু মুছিয়া সে রাত্রিটা থাকিতে সম্মত হইলাম। এ কথা ও কথার পর সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যদি না থাক, তবে যাবে কোথায়?"

আমি বলিলাম, "গঙ্গায়।"

এবার সুভাষিণীও একটু চক্ষু মুছিল। বলিল, "গঙ্গায় যাইতে হইবে না, আমি কি করি তা একটুখানি বসিয়া দেখ। গোলযোগ উপস্থিত করিও না—আমার কথা শুনিও।"

এই বলিয়া সুভাষিণী হারাণী বলিয়া ঝিকে ডাকিল। হারাণী সুভাষিণীর খাস্ ঝি। হারাণী আসিল। মোটা সোটা, কালো কুচ্‌কুচে, চাল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকল-তাতেই হাসি। একটু তিরবিরে। সুভাষিণী বলিল, "একবার তাঁকে ডেকে পাঠা।"

হারাণী বলিল, "এখন অসময়ে আসিবেন কি? আমি ডাকিয়া পাঠাই বা কি করিয়া?"

সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গ করিল, "যেমন করে পারিস্—ডাক গে যা।"

হারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি সুভাষিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাকিতে পাঠাইলে কাকে? তোমার স্বামীকে?"

সু। না ত কি পাড়ার মুদি মিন্‌ষেকে এই রাত্রে ডাকিতে পাঠাইব?

আমি বলিলাম, "বলি, আমায় উঠিয়া যাইতে হইবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

সুভাষিণী বলিল, "না। এইখানে বসিয়া থাক।"

সুভাষিণীর স্বামী আসিলেন। বেশ সুন্দর পুরুষ। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "তলব কেন?" তার পর আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ইনি কে?"

সুভাষিণী বলিল, "ওঁর জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আমাদের রাঁধুনী বাড়ী যাবে, তাই ওঁকে তার জায়গায় রাখিবার জন্য আমি মাসীর কাছ হইতে এনেছি। কিন্তু মা ওঁকে রাখিতে চান না।"

তাঁর স্বামী বলিলেন, "কেন চান না ?"

সু। সমস্ত বয়স।

সুভার স্বামী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা আমায় কি করিতে হইবে ?"

সু। ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে।

স্বামী। কেন ?

সুভাষিণী, তাঁহার নিকট গিয়া, আমি না শুনিতে পাই, এমন স্বরে বলিলেন, "আমার হুকুম।"

কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর স্বামীও তেমনই স্বরে বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

সুভা। কখন পারিবে ?

স্বামী। খাওয়ার সময়।

তিনি গেলে আমি বলিলাম, "উনি যেন রাখাইলেন, কিন্তু এমন কটু কথা সয়ে আমি থাকি কি প্রকারে ?"

সুভাষিণী। সে পরের কথা পরে হবে। গঙ্গা ত আর এক দিনে বুজিয়ে যাইবে না।

রাত্রি নয়টার সময়, সুভাষিণীর স্বামী (তাঁর নাম রমণ বাবু) আহার করিতে আসিলেন। তাঁর মা কাছে গিয়া বসিল। সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল, "কি হয় দেখি গে চল।"

আমরা আড়াল হইতে দেখিলাম, নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না হইয়াছে, কিন্তু রমণ বাবু একবার একটু করিয়া মুখে দিলেন, আর সরাইয়া রাখিলেন। কিছুই খাইলেন না। তাঁর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুই ত খেলি না বাবা !"

পুত্র বলিল, "ও রান্না ভূত প্রেতে খেতে পারে না। বামন ঠাকুরাণীর রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে গেছে। মনে করেছি কাল থেকে পিসীমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসব।"

তখন গৃহিণী ছোট হয়ে গেলেন। বলিলেন, "তা করতে হবে না যাদু ! আমি আর রাঁধুনী আনাইতেছি।

বাবু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন। দেখিয়া সুভাষিণী বলিল, "আমাদের জন্য ভাই ওঁর খাওয়া হইল না। তা না হোক—কাজটা হইলে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কি বলিতেছিলাম, এমন সময়ে হারাণী আসিয়া সুভাষিণীকে বলিল, "তোমার শাশুড়ী ডাকিতেছেন।" এই বলিয়া সে খানখা আমার দিকে চাহিয়া

একটু হাসিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, হাসি তার রোগ, সুভাষিণী শাশুড়ীর কাছে গেল, আমি আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম।

সুভাষিণীর শাশুড়ী বলিতে লাগিল, "সে কায়েৎ ছুঁড়ীটে চ'লে গেছে কি?"

সুভা। না—তার এখনও খাওয়া হয় নাই বলিয়া, যাইতে দিই নাই।

গৃহিণী বলিলেন, "সে রাঁধে কেমন?"

সুভা। তা জানি না।

গৃ। আজ না হয় সে নাই গেল। কাল তাকে দিয়া তুই একখানা রাঁধিয়ে দেখিতে হইবে।

সুভা। তবে তাকে রাখি গে।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি রাঁধিতে জান ত?"

আমি বলিলাম, "জানি। তা ত বলেছি।"

সুভা। ভাল রাঁধিতে পার ত?

আমি। কাল খেয়ে দেখে বুঝিতে পারিবে।

সুভা। যদি অভ্যাস না থাকে তবে বল, আমি কাছে বসিয়া শিখিয়ে দিব।

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "পরের কথা পরে হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবি পাণ্ডব

পরদিন রাঁধিলাম। সুভাষিণী দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিল, আমি ইচ্ছা করিয়া সেই সময়ে লঙ্কা ফোড়ন দিলাম—সে কাশিতে কাশিতে উঠিয়া গেল, বলিল, "মরণ আর কি!"

রান্না হইলে, বালকবালিকারা প্রথমে খাইল। সুভাষিণীর ছেলে অন্ন ব্যঞ্জন বড় খায় না, কিন্তু সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে ছিল। সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন রান্না হয়েছে, হেমা?"

সে বলিল, "বেশ! বেশ গো বেশ!" মেয়েটি বড় শ্লোক বলিতে ভালবাসিত, সে আবার বলিল, "বেশ গো বেশ,

রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ,
বকুল ফুলের মালা।
রাঙ্গা সাড়ী, হাতে হাঁড়ী,
রাঁধছে গোয়ালার বালা ॥
এমন সময়, বাজল বাঁশী,
কদম্বের তলে।
কাঁদিয়ে ছেলে, রান্না ফেলে,
রাঁধুনি ছোটে জলে ॥"

মা ধমকাইল, "নে শ্লোক রাখ্।" তখন মেয়ে চুপ করিল।

তার পর রমণ বাবু খাইতে বসিলেন। আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি সমস্ত ব্যঞ্জনগুলি কুড়াইয়া খাইলেন। গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। রমণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে রেঁধেছে মা ?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটি নূতন লোক আসিয়াছে।"

রমণ বাবু বলিলেন, "রাঁধে ভাল।" এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন।

তার পর কর্ত্তা খাইতে বসিলেন। সেখানে আমি যাইতে পারিলাম না—গৃহিণীর আদেশমত বুড়া বামন ঠাকুরাণী কর্ত্তার ভাত লইয়া গেলেন। এখন বুঝিলাম, গৃহিণীর কোথায় ব্যথা, কেন তিনি সমর্থবয়স্কা স্ত্রীলোক রাখিতে পারেন না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, যত দিন এখানে থাকি, সে দিক্ মাড়াইব না।

আমি সময়ান্তরে লোকজনের কাছে সংবাদ লইয়াছিলাম, কর্ত্তার কেমন চরিত্র। সকলেই জানিত, তিনি অতি ভদ্র লোক—জিতেন্দ্রিয়। তবে কালির বোতলটার গলায় গলায় কালি।

বামন ঠাকুরাণী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কর্ত্তা রান্না খেয়ে কি বললেন ?"

বামনী চটিয়া লাল ; চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "ও গো, বেশ রেঁধেছ গো, বেশ রেঁধেছ। আমরাও রাঁধিতে জানি ; তা বুড়ো হলে কি আর দর হয়! এখন রাঁধিতে গেলে রূপ যৌবন চাই।"

বুঝিলাম, কর্ত্তা খাইয়া ভাল বলিয়াছেন। কিন্তু বামনীকে নিয়া একটু রঙ্গ করিতে সাধ হইল। বলিলাম, "তা রূপ যৌবন চাই বই কি বামন দিদি!—বুড়ীকে দেখিলে কার খেতে রোচে ?"

দাঁত বাহির করিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে বামনী বলিল, "তোমারই বুঝি রূপ যৌবন থাকিবে ? মুখে পোকা পড়বে না ?"

এই বলিয়া রাগের মাথায় একটা হাঁড়ি চড়াইতে গিয়া পাচিকা দেবী হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম, "দেখিলে দিদি! রূপযৌবন না থাকিলে হাতের হাঁড়ি ফাটে।"

তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় বেড়ী নিয়া আমাকে তাড়া করিয়া মারিতে আসিলেন। বয়োদোষে কাণে একটু খাট, বোধ হয় আমার সকল কথা শুনিতে পান নাই। বড় কদর্য্য প্রত্যুত্তর করিলেন। আমারও রঙ্গ চড়িল। আমি বলিলাম, "দিদি, থামো। বেড়ী হাতে থাকিলেই ভাল।"

এই সময়ে সুভাষিণী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বামনী রাগে তাহাকে দেখিতে পাইল না। আমাকে আবার তাড়াইয়া আসিয়া বলিল, "হারামজাদী! যা মুখে আসে তাই বলিবি। বেড়ী আমার হাতে থাকিবে না ত কি পায়ে দেবে নাকি ? আমি পাগল।"

তখন সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গ করিয়া তাহাকে বলিল, "আমি লোক এনেছি, তুমি হারামজাদী বলবার কে ? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।"

তখন পাচিকা শশব্যস্তে বেড়ী ফেলিয়া দিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "ও মা সে কি কথা গো। আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম। এমন কথা আমি কখন মুখেও আনি নে। তোমরা আশ্চর্য্য করিলে মা!"

শুনিয়া সুভাষিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বামন ঠাকুরাণী তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন,—বলিলেন, "আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে আমি যেন গোল্লায় যাই—"

(আমি বলিলাম, "বালাই! ষাট্!")

"আমি যেন যমের বাড়ী যাই—"

(আমি। সে কি দিদি; এত সকাল সকাল! ছি দিদি। আর দুদিন থাক না।")

"আমার যেন নরকেও ঠাঁই হয় না—"

এবার আমি বলিলাম, "ওটি বলিও না, দিদি! নরকের লোক যদি তোমার রান্না না খেলে, তবে নরক আবার কি ?"

বুড়ী কাঁদিয়া সুভাষিণীর কাছে নালিশ করিল, "আমাকে যা মুখে আসিবে, তাই বলিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না ? আমি চল্লেম গিন্নীর কাছে।"

সুভা। বাছা, তা হলে আমাকেও বলিতে হইবে, তুমি এঁকে হারামজাদী বলেছ।

বুড়ী তখন গালে চড়াইতে আরম্ভ করিল, "আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম! (এক ঘা)—আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম!! (দুই ঘা)—আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম!!! (তিন ঘা) ইতি সমাপ্ত।

তখন আমরা বুড়ীকে কিছু মিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে আমি বলিলাম, "হাঁ গা বৌ ঠাকুরাণ—হারামজাদী বলতে তুমি কখন্ শুনিলে? উনি কখন্ এ কথা বললেন? কই আমি ত শুনি নাই।"

বুড়ী তখন বলিল, "এই শুনিলে বৌ দিদি! আমার মুখে কি অমন সব কথা বেরোয়!"

সুভাষিণী বলিল, "তা হবে—বাহিরে কে কাকে বলিতেছিল, সেই কথাটা আমার কাণে গিয়া থাকিবে। বামুন ঠাকুরাণী কি তেমন লোক! ওঁর রান্না কাল খেয়েছিলে ত? এ কলিকাতার ভিতর অমন কেউ রাঁধিতে পারে না।"

বামনী আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "শুনলে গা?"

আমি বলিলাম, "তা ত সবাই বলে। আমি অমন রান্না কখনও খাই নাই।"

বুড়ী এক গাল হাসিয়া বলিল, "তা তোমরা বলবে বৈ কি মা! তোমরা হলে ভাল মানুষের মেয়ে, তোমরা ত রান্না চেন। আহা! এমন মেয়েকে কি আমি গালি দিতে পারি—এ কোন বড় ঘরের মেয়ে। তা তুমি দিদি ভেবো না, আমি তোমাকে রান্না বান্না শিখিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

বুড়ীর সঙ্গে এইরূপে আপোষ হইয়া গেল। আমি অনেক দিন ধরিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলাম। অনেক দিনের পর আজ হাসিলাম। সে হাসি তামাসা দরিদ্রের নিধির মত, বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। তাই বুড়ীর কথাটা এত সবিস্তারে লিখিলাম। সেই হাসি আমি এ জন্মে ভুলিব না। আর কখন হাসিয়া তেমন সুখ পাইব না।

তার পর গৃহিণী আহারে বসিলেন। বসিয়া থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যঞ্জনগুলি খাওয়াইলাম। মাগী গিলিল অনেক। শেষ বলিল, "রাঁধ ভাল ত গা! কোথায় রান্না শিখিলে?"

আমি বলিলাম, "বাপের বাড়ী।"

গৃহি। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা?

আমি একটা মিছে কথা বলিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "এ ত বড় মানুষের ঘরের মত রান্না। তোমার বাপ কি বড় মানুষ ছিলেন?"

আমি। তা ছিলেন।

গৃহি। তবে তুমি রাঁধিতে এসেছ কেন?

আমি। দুরবস্থায় পড়িয়াছি।

গৃহি। তা আমার কাছে থাক, বেশ থাকিবে। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনই থাকিবে।

পরে সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌ মা, দেখো গো, এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে—আর তুমি ত বলবেই না, তুমি তেমন মানুষের মেয়ে নও।"

সুভাষিণীর ছেলে সেখানে বসিয়াছিল। ছেলে বলিল, "আমি কলা কতা বলব।"

আমি বলিলাম, "বল দেখি।"

সে বলিল, "কলা চাতু (চাটু) হাঁলি—আল্ কি মা?"

সুভাষিণী বলিল, "আর তোর শাশুড়ী।"

ছেলে বলিল, "কৈ ছাছুলী?"

সুভাষিণীর মেয়ে আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ তোর শাশুড়ী।"

তখন ছেলে বলিতে লাগিল, "কুমুডিনী ছাছুলী। কুমুডিনী ছাছুলী।"

সুভাষিণী আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য বেড়াইতেছিল। ছেলে মেয়ের মুখের এই কথা শুনিয়া সে আমাকে বলিল, "তবে আজ হইতে তুমি আমার বেহাইন হইলে।"

তার পর সুভাষিণী খাইতে বসিল। আমি তারও কাছে খাওয়াইতে বসিলাম। খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কয়টি বিয়ে, বেহান?"

কথাটা বুঝিলাম। বলিলাম, "কেন, রান্নাটা দ্রৌপদীর মত লাগিল না কি?"

সুভা। ও ইয়াস্! বিবি পাণ্ডব ফাষ্ট কেলাস বাবর্চি ছিল। এখন আমার শাশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে ত?

আমি বলিলাম, "বড় নয়। কাঙ্গালের আর বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে সকলেই একটু প্রভেদ করে।"

সুভাষিণী হাসিয়া উঠিল। বলিল, "মরণ আর কি তোমার! এই বুঝি বুঝিয়াছ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব'লে বুঝি তোমার আদর করেছেন?"

আমি বলিলাম, "তবে কি?"

সুভা। ওঁর ছেলে পেট ভরে খাবে, তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি একটু কোট কর, তবে তোমার মাইনা ডবল হইয়া যায়।

আমি বলিলাম, "আমি মাহিনা চাই না। না লইলে যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এজন্য হাত পাতিয়া মাহিয়ানা লইব। লইয়া তোমার নিকট রাখিব, তুমি কাঙ্গাল গরীবকে দিও। আমি আশ্রয় পাইয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

নবম পরিচ্ছেদ

পাকাচুলের সুখ দুঃখ

আমি আশ্রয় পাইলাম। আর একটি অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটি হিতৈষিণী সখী। দেখিতে লাগিলাম যে, সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক ভালবাসিতে লাগিল—আপনার ভগিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত। তাঁর শাসনে দাসদাসীরাও আমাকে অমান্য করিত না। এদিকে রান্নাবান্না সম্বন্ধেও সুখ হইল। সেই বুড়ী ব্রাহ্মণঠাকুরাণী,—তাহার নাম সোণার মা,—তিনি বাড়ী গেলেন না। মনে করিলেন, তিনি গেলে আর চাকরিটি পাইবেন না, আমি কায়েমী হইব। তিনি এই ভাবিয়া নানা ছুতা করিয়া বাড়ী গেলেন না। সুভাষিণীর সুপারিসে আমরা দুই জনেই রহিলাম। তিনি শাশুড়ীকে বুঝাইলেন যে, কুমুদিনী ভদ্রলোকের মেয়ে, একা সব রান্না পারিয়া উঠিবে না—আর সোণার মা বুড় মানুষই বা কোথায় যায়? শাশুড়ী বলিল, "দুই জনকেই কি রাখিতে পারি? এত টাকা যোগায় কে?"

বধূ বলিল, "তা এক জনকে রাখিতে হলে সোণার মাকে রাখিতে হয়। কুমু এত পারবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "না না। সোণার মার রান্না আমার ছেলে খেতে পারে না। তবে দুই জনেই থাক্।"

আমার কষ্টনিবারণ জন্য সুভাষিণী এই কৌশলটুকু করিল। গিন্নী তার হাতে কলের পুতুল; কেন না, সে রমণের বৌ—রমণের বৌর কথা ঠেলে কার সাধ্য? তাতে আবার সুভাষিণীর বুদ্ধি যেমন প্রখরা, স্বভাবও তেমনই সুন্দর। এমন বন্ধু পাইয়া, আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল।

আমি মাছ মাংস রাঁধি, বা দুই একখানা ভাল ব্যঞ্জন রাঁধি—বাকি সময়টুকু সুভাষিণীর সঙ্গে গল্প করি—তার ছেলে মেয়ের সঙ্গে গল্প করি; হলো বা স্বয়ং গৃহিণীর

সঙ্গে একটু ইয়ারকি করি। কিন্তু শেষ কাজটায় একটা বড় গোলে পড়িয়া গেলাম। গৃহিণীর বিশ্বাস তাঁর বয়স কাঁচা, কেবল অদৃষ্টদোষে গাছকতক চুল পাকিয়াছে, তাহা তুলিয়া দিলেই তিনি আবার যুবতী হইতে পারেন। এই জন্য তিনি লোক পাইলেই এবং অবসর পাইলেই পাকা চুল তুলাইতে বসিতেন। এক দিন আমাকে এই কাজে বেগার ধরিলেন। আমি কিছু ক্ষিপ্রহস্ত, শীঘ্র শীঘ্রই ভাদ্র মাসের উলু ক্ষেত সাফ করিতেছিলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সুভাষিণী আমাকে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে ডাকিল। আমি গৃহিণীর কাছ হইতে ছুটি লইয়া বধূর কাছে গেলাম। সুভাষিণী বলিল, "ও কি কাণ্ড। আমার শাশুড়ীকে নেড়া মুড়া করিয়া দিতেছ কেন ?"

আমি বলিলাম, "ও পাপ একদিনে চুকানই ভাল।"

সুভা। তা হলে কি টেঁকৃতে পারবে ? যাবে কোথায় ?

আমি। আমার হাত থামে না যে।

সুভা। মরণ আর কি। দুই একগাছি তুলে চলে আসতে পার না।

আমি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না।

সুভা। বল গে যে, কই, পাকা চুল ত বেশী দেখিতে পাই না—এই ব'লে চ'লে এসো।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এমন দিনেডাকাতি কি করা যায় ? লোকে বলবে কি ? এ যে আমার কালাদীঘির ডাকাতি।"

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি ?

সুভাষিণীর সঙ্গে কথা কহিতে আমি একটু আত্মবিস্মৃত হইতাম—হঠাৎ কালাদীঘির কথা অসাবধানে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। কথাটা চাপিয়া গেলাম। বলিলাম, "সে গল্প আর একদিন করিব।"

সুভা। আমি যা বলিলাম, তা একবার বলিয়াই দেখ না ? আমার অনুরোধে।

হাসিতে হাসিতে আমি গিন্নীর কাছে গিয়া আবার পাকা চুল তুলিতে বসিলাম। দুই চারি গাছা তুলিয়া বলিলাম, "কৈ আর বড় পাকা দেখিতে পাই না। দুই এক গাছা রহিল, কাল তুলে দিব।"

মাগী এক গাল হাসিল। বলিল, "আবার বেটীরা বলে সব চুলই পাকা।"

সে দিন আমার আদর বাড়িল। কিন্তু যাহাতে দিন দিন বসিয়া বসিয়া পাকা চুল তুলিতে না হয়, সে ব্যবস্থা করিব মনে মনে স্থির করিলাম। বেতনের টাকা পাইয়াছিলাম,

তাহা হইতে একটা টাকা হারাণীর হাতে দিলাম। বলিলাম, "একটা টাকার এক শিশি কলপ কারও হাত দিয়া কিনিয়া আনিয়া দে।" হারাণী হাসিয়া কুটপাট। হাসি থামিলে বলিল, "কলপ নিয়ে কি করবে গা? কার চুলে দেবে?"

আমি। বামন ঠাকুরাণীর।

এবার হারাণী হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল। এমন সময়ে বামন ঠাকুরাণী সেখানে আসিয়া পড়িল। তখন সে, হাসি থামাইবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিতে লাগিল। কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল। বামন ঠাকুরাণী বলিলেন, "ও অত হাসিতেছে কেন?"

আমি বলিলাম, "ওর অন্য কাজ ত দেখি না। এখন আমি বলিয়াছিলাম যে, বামন ঠাকুরাণীর চুলে কলপ দিয়া দিলে হয় না? তাই অমন করছিল।"

বামন ঠা। তা অত হাসি কিসের? দিলেই বা ক্ষতি কি? শোণের নুড়ি শোণের নুড়ি ব'লে ছেলেগুলা খেপায়, তা সে দায়ে ত বাঁচব!"

সুভাষিণীর মেয়ে হেমা অমনই আরম্ভ করিল,

চলে বুড়ী, শোণের নুড়ী,
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল।
হাতে নড়ি, গলায় দড়ী,
কাণে জোড়া দুল।

হেমার ভাই বলিল, "জোলা হুম্!" তখন কাহারও উপর জোলা হুম্ পড়িবে আশঙ্কায় সুভাষিণী তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল।

বুঝিলাম, বামনীর কলপে বড় ইচ্ছা। বলিলাম, "আচ্ছা, আমি কলপ দিয়া দিব।"

বামনী বলিল, "আচ্ছা, তাই দিও। তুমি বেঁচে থাক, তোমার সোনার গহনা হোক। তুমি খুব রাঁধতে শেখ।"

হারাণী হাসে, কিন্তু কাজের লোক। শীঘ্র এক শিশি উত্তম কলপ আনিয়া দিল। আমি তাহা হাতে করিয়া গিন্নীর পাকা চুল তুলিতে গেলাম। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে কি ও?"

আমি বলিলাম, "একটা আরক। এটা চুলে মাখাইলে সব পাকা চুল উঠিয়া আসে, কাঁচা চুল থাকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "বটে, এমন আশ্চর্য্য আরক ত কখন শুনি নাই। ভাল, মাথাও দেখি। দেখিও কলপ দিও না যেন।"

আমি উত্তম করিয়া তাঁহার চুলে কলপ মাখাইয়া দিলাম। দিয়া, "পাকা চুল আর নাই," বলিয়া চলিয়া গেলাম। নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সমস্ত চুলগুলি কাল হইয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হারাণী ঘরঝাঁট দিতে দিতে তাহা দেখিতে পাইল। তখন সে ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে সদর-বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে "কি ঝি? কি ঝি?" এই রকম একটা গোলযোগ হইলে, সে আবার ভিতর বাড়ীতে আসিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিতে গুঁজিতে ছাদের উপর চলিয়া গেল। সেখানে সোনার মা চুল শুকাইতেছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" হারাণী হাসির জ্বালায় কথা কহিতে পারিল না; কেবল হাত দিয়া মাথা দেখাইতে লাগিল। সোনার মা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, নীচে আসিয়া দেখিল যে, গৃহিণীর মাথার চুল সব কালো—সে ফুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "ও মা! এ কি হলো গো! তোমার মাথার সব চুল কালো হয়ে গেছে গো! ওমা কে না জানি তোমায় ওষুধ করিল!"

এমন সময় সুভাষিণী আসিয়া আমাকে পাকড়াইল—হাসিতে হাসিতে বলিল, "পোড়ারমুখী, ও করেছ কি, মার চুলে কলপ দিয়াছ?"

আমি। হুঁ!

সুভা। তোমার মুখে আগুন! কি কাণ্ডখানা হয় দেখ!

আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এমন সময়ে গৃহিণী স্বয়ং আমাকে তলব করিলেন। বলিলেন, "হাঁ গা কুমো! তুমি কি আমার মাথায় কলপ দিয়াছ?"

দেখিলাম, গৃহিণীর মুখখানা বেশ প্রসন্ন। আমি বলিলাম, "অমন কথা কে বল্লে মা!"

গৃ। এই যে সোনার মা বলছে!

আমি। সোনার মার কি? ও কলপ নয় মা, আমার ওষুধ।

গৃ। তা বেশ ওষুধ বাছা। আরসি একখানা আন দেখি।

একখানা আরসি আনিয়া দিলাম। দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, সব চুল কালো হয়ে গেছে! আঃ, আবাগের বেটী, লোকে এখনই বলবে কলপ দিয়েছে।"

গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। সে দিন সন্ধ্যার পর আমার রান্নার সুখ্যাতি করিয়া আমার বেতন বাড়াইয়া দিলেন। আর বলিলেন, "বাছা! কেবল কাচের চুরি হাতে দিয়া

বেড়াও, দেখিয়া কষ্ট হয়।” এই বলিয়া তিনি নিজের বহুকালপরিত্যক্ত এক জোড়া সোনার বালা আমায় বখশিস করিলেন। লইতে, আমার মাথা কাটা গেল—চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না। কাজেই “লইব না” কথাটা বলিবার অবসর পাইলাম না।

একটু অবসর পাইয়া বুড়া বামন ঠাকুরাণী আমাকে ধরিল। বলিল, “ভাই, আর সে ওষুধ নেই কি?”

আমি। কোন্ ওষুধ? বামনীকে তার স্বামী বশ করবার জন্যে যা দিয়েছিলেম?

বামনী। দূর হ! একেই বলে ছেলে বুদ্ধি। আমার কি সে সামগ্রী আছে?

আমি। নেই? সে কি গো? একটাও না?

বামনী। তোদের বুঝি পাঁচটা ক'রে থাকে?

আমি। তা নইলে আর অমন রাঁধি? দ্রৌপদী না হ'লে ভাল রাঁধা যায়! গোটা পাঁচেক যোটাও না, রান্না খেয়ে লোকে অজ্ঞান হবে।

বামনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, “একটাই যোটে না ভাই—তার আবার পাঁচটা! মুসলমানের হয়, যত দোষ হিন্দুর মেয়ের। আর হবেই বা কিসে? এই ত শোণের নুড়ী চুল! তাই বলছিলাম, বলি সে ওষুধটা আর আছে, যাতে চুল কালো হয়?”

আমি। তাই বল! আছে বৈ কি।

আমি তখন কলপের শিশি বামন ঠাকুরাণীকে দিয়া গেলাম। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী, রাত্রিতে জলযোগান্তে শয়নকালে, অন্ধকারে, তাহা চুলে মাখাইয়াছিলেন; কতক চুলে লাগিয়াছিল, কতক চুলে লাগে নাই, কতক বা মুখে চোখে লাগিয়াছিল। সকাল বেলা যখন তিনি দর্শন দিলেন, তখন চুলগুলা পাঁচরঙ্গা বেরালের লোমের মত, কিছু সাদা, কিছু রাঙ্গা, কিছু কালো; আর মুখখানি কতক মুখপোড়া বাঁদরের মত, কতক মেনি বেরালের মত। দেখিবা মাত্র পৌরবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। যে যখন পাচিকাকে দেখে, সে তখনই হাসিয়া উঠে। হারাণী হাসিতে হাসিতে বেদম হইয়া সুভাষিণীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “বৌঠাকুরাণী আমাকে জবাব দাও, আমি এমন হাসির বাড়ীতে থাকিতে পারিব না—কোন্ দিন দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব।”

সুভাষিণীর মেয়েও বুড়ীকে জ্বালাইল, বলিল, “বুড়ী পিসী—সাজ সাজালে কে?

যম বলেছে, সোনার চাঁদ

এস আমার ঘরে।

তাই ঘাটের সজ্জা সাজিয়ে দিলে
সিঁদুরে গোবরে।"

একদিন একটা বিড়ালে হাঁড়ি হইতে মাছ খাইয়াছিল, তাহার মুখে কালি ঝুলি লাগিয়াছিল। সুভাষিণীর ছেলে তাহা দেখিয়াছিল। সে বুড়ীকে দেখিয়া বলিল, "মা! বুলী পিচী হাঁলি কেয়েসে।"

অথচ বামন ঠাকুরাণীর কাছে, আমার ইঙ্গিতমত, কথাটা কেহ ভাঙ্গিল না। তিনি অকাতরে সেই বানরমার্জ্জারবিমিশ্র কান্তি সকলের সম্মুখে বিকশিত করিতে লাগিলেন। হাসি দেখিয়া তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা কেন হাসচ গা?"

সকলেই আমার ইঙ্গিতমত বলিল, "ঐ ছেলে কি বলচে শুনচো না? বলে, বুলী পিচী হাঁলি কেয়েসে। কাল রাতে কে তোমার হাঁড়িশালে হাঁড়ি খেয়ে গিয়েছে, তাই সবাই বলাবলি করচে, বলি সোনার মা কি বুড়া বয়সে এমন কাজ করবে?"

বুড়ী তখন গালির ছড়া আরম্ভ করিল—"সর্ব্বনাশীরা! শতেকক্ষোয়ারীরা! আবাগীরা!"—ইত্যাদি ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের স্বামী-পুত্রকে গ্রহণ করিবার জন্য যমকে অনেক বার তিনি আমন্ত্রণ করিলেন—কিন্তু যমরাজ সে বিষয়ে আপাততঃ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ঠাকুরাণীর চেহারাখানা সেই রকম রহিল। তিনি সেই অবস্থায় রমণ বাবুকে অন্ন দিতে গেলেন। রমণ বাবু দেখিয়া হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইলেন, আর তাঁহার খাওয়া হইল না। শুনিলাম রামরাম দত্তকে অন্ন দিতে গেলে, কর্ত্তা মহাশয় তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

শেষ দয়া করিয়া সুভাষিণী বুড়ীকে বলিয়া দিল, "আমার ঘরে বড় আয়না আছে। মুখ দেখ গিয়া।"

বুড়ী গিয়া মুখ দেখিল। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং আমাকে গালি পাড়িতে লাগিল। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমি চুলে মাখাইতে বলিয়াছিলাম, মুখে মাখাইতে বলি নাই। বুড়ী তাহা বুঝিল না। আমার মুণ্ডভোজনের জন্য যম পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। শুনিয়া সুভাষিণীর মেয়ে শ্লোক পড়িল—

"যে ডাকে যমে।
তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই।
বুড়ী মরে যা না ভাই।"

শেষে আমার সেই তিন বৎসর বয়সের জামাতা, একখানা রাঁধিবার চেলা কাঠ লইয়া গিয়া বুড়ীর পিঠে বসাইয়া দিল। বলিল, "আমাল্ চাচুলী।" তখন বুড়ী আছাড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে যত কাঁদে, আমার জামাই তত হাততালি দিয়া নাচে, আর বলে, "আমাল্ চাচুলী, আমাল্ চাচুলী!" আমি গিয়া তাকে কোলে নিয়া, তার মুখচুম্বন করিলে তবে থামিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আশার প্রদীপ

সেই দিন বৈকালে সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া নিভৃতে বসাইল। বলিল, "বেহান! তুমি সেই কালাদীঘির ডাকাতির গল্পটি বলিবে বলিয়াছিলে—আজিও বল নাই। আজ বল না—শুনি।"

আমি অনেকক্ষণ ভাবিলাম। শেষ বলিলাম, "সে আমারই হতভাগ্যের কথা। আমার বাপ বড় মানুষ, এ কথা বলিয়াছি। তোমার শ্বশুরও বড় মানুষ—কিন্তু তাঁহার তুলনায় কিছুই নহেন। আমার বাপ আজিও আছেন—তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য এখনও আছে, আজিও তাঁহার হাতীশালে হাতী বাঁধা। আমি যে রাঁধিয়া খাইতেছি, কালাদীঘির ডাকাতিই তাহার কারণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুই জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। সুভাষিণী বলিল, "তোমার যদি বলিতে কষ্ট হয়, তবে নাই বলিলে। আমি না জানিয়াই শুনিতে চাহিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সমস্তই বলিব। তুমি আমাকে যে স্নেহ কর, আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে বলিতে কোন কষ্ট নাই।"

আমি বাপের নাম বলিলাম না, বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না। স্বামীর বা শ্বশুরের নাম বলিলাম না। শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না। আর সমস্ত বলিলাম, সুভাষিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্য্যন্ত বলিলাম। শুনিতে শুনিতে সুভাষিণী কাঁদিতে লাগিল। আমিও যে বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য।

সে দিন এই পর্য্যন্ত। পরদিন সুভাষিণী আমাকে আবার নিভৃতে লইয়া গেল। বলিল, "বাপের নাম বলিতে হইবে।"

তাহা বলিলাম।

"তাঁর বাড়ী যে গ্রামে তাহাও বলিতে হইবে।"

তাও বলিলাম।

সু। ডাকঘরের নাম বল।

আ। ডাকঘর। ডাকঘরের নাম ডাকঘর।

সু। দূর পোড়ারমুখী। যে গ্রামে ডাকঘর, তার নাম।

আমি। তা ত জানি না। ডাকঘরই জানি।

সু। বলি, যে গ্রামে তোমাদের বাড়ী, সেই গ্রামেই ডাকঘর আছে, না অন্য গ্রামে?

আমি। তা ত জানি না।

সুভাষিণী বিষণ্ণ হইল। আর কিছু বলিল না। পরদিন সেইরূপ নিভৃতে বলিল, "তুমি বড় ঘরের মেয়ে, কত কাল আর রাঁধিয়া খাইবে? তুমি গেলে আমি বড় কাঁদিব—কিন্তু আমার সুখের জন্য তোমার সুখের ক্ষতি করি, এমন পাপিষ্ঠা আমি নই। তাই আমরা পরামর্শ করিয়াছি—"

কথা শেষ না হইতে হইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কে কে?"

সু। আমি আর র-বাবু।

র-বাবু কি না রমণ বাবু! এইরূপে সুভাষিণী আমার কাছে স্বামীর নাম ধরিত। তখন সে বলিতে লাগিল, "পরামর্শ করিয়াছি যে, তোমার বাপকে পত্র লিখিব যে, তুমি এইখানে আছ, তাই কাল ডাকঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

আমি। তবে সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছ?

সু। বলিয়াছি—দোষ কি?

আমি। দোষ কিছু না। তার পর?

সু। এখন মহেশপুরেই ডাকঘর আছে, বিবেচনা করিয়া পত্র লেখা হইল।

আমি। পত্র লেখা হইয়াছে না কি?

সু। হাঁ।

আমি আহ্লাদে আটখানা হইলাম। দিন গণিতে লাগিলাম, কত দিনে পত্রের উত্তর আসিবে। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। আমার কপাল পোড়া—মহেশপুরে কোন ডাকঘর

ছিল না। তখন গ্রামে গ্রামে ডাকঘর হয় নাই। ভিন্ন গ্রামে ডাকঘর ছিল—আমি রাজার দুলালী—অত খবর রাখিতাম না। ডাকঘরের ঠিকানা না পাইয়া, কলিকাতার বড় ডাকঘরে রমণ বাবুর চিঠি খুলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল।

আমি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু র-বাবু—নাছোড়। সুভাষিণী আসিয়া আমাকে বলিল, "এখন স্বামীর নাম বলিতে হইবে।"

আমি তখন লিখিতে শিখিয়াছিলাম। স্বামীর নাম লিখিয়া দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা হইল, "শ্বশুরের নাম ?"

তাও লিখিলাম।

"গ্রামের নাম ?"

তাও বলিয়া দিলাম।

"ডাকঘরের নাম ?"

বলিলাম, "তা কি জানি ?"

শুনিলাম রমণ বাবু সেখানেও পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বড় বিষণ্ণ হইলাম। কিন্তু একটা কথা তখন মনে পড়িল, আমি আশায় বিহ্বল হইয়া পত্র লিখিতে বারণ করি নাই। এখন আমার মনে পড়িল, ডাকাতে আমাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; আমার কি জাতি আছে ? এই ভাবিয়া, শ্বশুর স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন সন্দেহ নাই। সে স্থলে, পত্র লেখা ভাল হয় নাই। এ কথা শুনিয়া সুভাষিণী চুপ করিয়া রহিল।

আমি এখন বুঝিলাম যে, আমার আর ভরসা নাই। আমি শয্যা লইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটা চোরা চাহনি

এক দিবস প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, কিছু ঘটার আয়োজন। রমণ বাবু উকীল। তাঁহার একজন বড় মোয়াক্কেল ছিল। দুই দিন ধরিয়া শুনিতেছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। রমণ বাবু ও তাঁহার পিতা সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সহিত কারবার-ঘটিত

কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজ শুনিলাম, তাঁহাকে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাই পাকশাকের কিছু বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

রান্না ভাল চাই—অতএব পাকের ভারটা আমার উপর পড়িল। যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল। রামরাম বাবু, রমণ বাবু, ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলেন। পরিবেশনের ভার বুড়ীর উপর—আমি বাহিরের লোককে কখন পরিবেশন করি না।

বুড়ী পরিবেশন করিতেছে—আমি রান্নাঘরে আছি—এমন সময়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। রমণ বাবু বুড়ীকে বড় ধমকাইতেছিলেন। সেই সময়ে এক জন রান্নাঘরের ঝি আসিয়া বলিল, "ইচ্ছে ক'রে লোককে অপ্রতিভ করা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে ?"

ঝি বলিল, "বুড়ী দাদা বাবুর বাটিতে (বুড়া ঝি, দাদাবাবু বলিত)—বাটিতে ডাল দিতেছিল—তিনি তা দেখেও উঁহু! উঁহু! ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলেন—সব ডাল হাতে পড়িয়া গেল।"

আমি এদিকে শুনিতেছিলাম, রমণ বাবু বামনীকে ধমকাইতেছেন, "পরিবেশন করতে জান না ত এসো কেন ? আর কাকেও থাল দিতে পার নি ?"

রামরাম বাবু বলিলেন, "তোমার কর্ম্ম নয়। কুমোকে পাঠাইয়া দাও গিয়া।"

গৃহিণী সেখানে নাই, বারণ করে কে ? এদিকে খোদ কর্ত্তার হুকুম—অমান্যই বা করি কি প্রকারে ? গেলেই গিন্নী বড় রাগ করিবেন, তাও জানি। দুই চারিবার বুড়ীকে বুঝাইলাম—বলিলাম, "একটু সাবধান হ'য়ে দিও থুইও—কিন্তু সে ভয়ে আর যাইতে স্বীকৃত হইল না। কাজেই, আমি হাত ধুইয়া, মুখ মুছিয়া, পরিষ্কার হইয়া, কাপড়খানা গুছাইয়া পরিয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া, পরিবেশন করিতে গেলাম। কে জানে যে এমন কাণ্ড বাধিবে ? আমি জানি যে, আমি বড় বুদ্ধিমতী—জানিতাম না যে, সুভাষিণী আমায় এক হাটে বেচিতে পারে, আর এক হাটে কিনিতে পারে।

আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয় ; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল। আমি বিদ্যুচ্চমকিতের ন্যায় একটু অন্যমনস্ক হইলাম। মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমি ঘোমটার ভিতর

হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছি। আমি ত জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কুটিল কটাক্ষ করি নাই। তত পাপ এ হৃদয়ে ছিল না। তবে সাপও বুঝি, জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া ফণা ধরে না; ফণা ধরিবার সময় উপস্থিত হইলেই ফণা আপনি ফাঁপিয়া উঠে। সাপেরও পাপহৃদয় না হইতে পারে। বুঝি সেইরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে। বুঝি তিনি একটা কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া থাকিবেন। পুরুষ বলিয়া থাকেন যে, অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠনমধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদয় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু অসুখী হইলাম। আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণীনিক্ষেপে বুঝি তরঙ্গ উঠিল ভাবিয়া বড় অপ্রফুল্ল হইলাম। মনে মনে নারীজন্মে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলাম; মনের ভিতর মরিয়া গেলাম।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া আমার যেন মনে হইল, আমি ইঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহভঞ্জনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইঁহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমন সময়ে রামরাম বাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম, ইনি সেই কটাক্ষটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রামরাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন যে, পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রামরাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, "হাঁ, উনি রাঁধেন ভাল।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "তোমার মাথামুণ্ড রাঁধি।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে, আপনার বাড়ীতে দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "চিনিয়াছি।" বস্তুতঃ দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের নিজদেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, "তা হবে, ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।"

ইনি এবার যো পাইলেন, একবারে আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায় গা ?"

আমার প্রথম সমস্যা, কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম, কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব, না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এরূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাতুর্য্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল, এখন আর একটা বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম, "আমাদের বাড়ী কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ত্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। এই মাত্র যে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম যে, তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন, "উপেন্দ্র বাবু, আহার করুন না।" ঐটি শুনিবার আমার বাকি ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল ?" আমি মাংসের পাত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হারাণীর হাসিবন্ধ

এখন হইতে এই ইতিবৃত্তমধ্যে পাঁচ শত বার আমার স্বামার নাম করা আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দাও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার নাম করিব? পাঁচ শত বার "স্বামী" "স্বামী" করিয়া কান জ্বালাইয়া দিব? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামীকে "উপেন্দ্র" বলিতে আরম্ভ করিব? না, "প্রাণনাথ" "প্রাণকান্ত" "প্রাণেশ্বর" "প্রাণপতি" এবং "প্রাণাধিকে"র ছড়াছড়ি করিব? যিনি আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (দাসদাসীগণের অনুকরণ করিয়া) স্বামীকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে "বাবুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।

মাংসপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, মনে মনে স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।"

এই ভাবিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজনস্থান হইতে বহির্ব্বাটীতে গমনকালে যে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে মনে বলিলাম যে, "যদি ইনি এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে না যান, তবে আমি এ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই।" আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিও—আমি মাথার কাপড় বড় খাটো করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অগ্রে অগ্রে রমণ বাবু গেলেন; তিনি চারিদিক্ চাহিতে চাহিতে গেলেন, যেন খবর লইতেছেন, কে কোথায় আছে। তার পর রামরাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তার পর আমার স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারিদিকে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবামাত্র, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ,

কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয়, "প্রাণনাথ" আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।

আমি তখন হারাণীর শরণাগত হইব মনে করিলাম। নিভৃতে ডাকিবামাত্র সে হাসিতে হাসিতে আসিল। সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "পরিবেশনের সময় বামন ঠাকুরাণীর নাকালটা দেখিয়াছিলে?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার হাসির ফোয়ারা খুলিল।

আমি বলিলাম, "তা জানি, কিন্তু আমি তার জন্য তোকে ডাকি নাই। আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর্। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী একেবারে হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধুঁয়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল। হারাণী গম্ভীরভাবে বলিল, "ছি! দিদি ঠাকরুন্! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ্—আমার এ উপকার করবি কি না বল্।"

হারাণী বলিল, "কিছুতেই আমা হইতে এ কাজ হইবে না।"

আমি খালি হাতে হারাণীর কাছে আসি নাই। মাহিয়ানার টাকা ছিল; পাঁচটা তাহার হাতে দিলাম। বলিলাম, "আমার মাথা খাস্, এ কাজ তোকে করিতেই হইবে।"

হারাণী টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু তাহা না দিয়া, নিকটে উনান নিকাইবার এক ঝুড়ি মাটি ছিল, তাহার উপর রাখিয়া দিল। বলিল—অতি গম্ভীরভাবে, আর হাসি নাই—"তোমার টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলাম, কিন্তু শব্দ হইলে একটা কেলেঙ্কারি হইবে, তাই আস্তে আস্তে এইখানে রাখিলাম—কুড়াইয়া লও। আর এ সকল কথা মুখে এনো না।"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। হারাণী বিশ্বাসী, আর সকলে অবিশ্বাসী, আর কাহাকে ধরিব? আমার কান্নার প্রকৃত তাৎপর্য্য সে জানিত না। তথাপি তার দয়া হইল। সে বলিল, "কাঁদ কেন? চেনা মানুষ না কি?"

আমি একবার মনে করিলাম, হারাণীকে সব খুলিয়া বলি। তার পর ভাবিলাম, সে এত বিশ্বাস করিবে না, একটা বা গণ্ডগোল করিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্থির করিলাম,

সুভাষিণী ভিন্ন আমার গতি নাই। সেই আমার বুদ্ধি, সেই আমার রক্ষাকারিণী—তাহাকে সব খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ করি গিয়া। হারাণীকে বলিলাম, "চেনা মানুষ বটে—বড় চেনা, সকল কথা শুনিলে তুই বিশ্বাস করিবি না, তাই তোকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম না। কিছু দোষ নাই।"

"কিছু দোষ নাই," বলিয়া একটু ভাবিলাম। আমারই পক্ষে কিছু দোষ নাই, কিন্তু হারাণীর পক্ষে? দোষ আছে বটে। তবে তাকে কাদা মাখাই কেন? তখন সেই "বাজিয়ে যাব মল" মনে পড়িল। কুতর্কে মনকে বুঝাইলাম। যাহার দুর্দ্দশা ঘটে, সে উদ্ধারের জন্য কুতর্ক অবলম্বন করে। আমি হারাণীকে আবার বুঝাইলাম, "কিছু দোষ নাই।"

হা। তোমাকে কি তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে হইবে?

আমি। হাঁ।

হা। কখন?

আমি। রাত্রে—সবাই ঘুমাইলে।

হা। একা?

আমি। একা।

হা। আমার বাপের সাধ্য নহে।

আমি। আর বৌ ঠাকুরাণী যদি হুকুম দেন?

হা। তুমি কি পাগল হয়েছ? তিনি কুলের কুলবধূ—সতী লক্ষ্মী, তিনি কি এ সব কাজে হাত দেন।

আমি। যদি বারণ না করেন, যাবি?

হারাণী। যাব। তাঁর হুকুমে না পারি কি?

আমি। যদি বারণ না করেন?

হারাণী। যাব, কিন্তু তোমার টাকা নিব না। তোমার টাকা তুমি নাও।

আমি। আচ্ছা, তোকে যেন সময়ে পাই।

আমি তখন চোখের জল মুছিয়া সুভাষিণীর সন্ধানে গেলাম। তাহাকে নিভৃতেই পাইলাম। আমাকে দেখিয়া সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি, যেন সকালের পদ্মের মত, যেন সন্ধ্যাবেলার গন্ধরাজের মত, আহ্লাদে ফুটিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ, যেন সকালবেলার সর্ব্বত্র পুষ্পিত শেফালিকার মত, যেন চন্দ্রোদয়ে নদীস্রোতের মত, আনন্দে প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন চিনিয়াছ ত?"

আমি আকাশ থেকে পড়িলাম। বলিলাম, "সে কি? তুমি কেমন ক'রে জানলে?" সুভাষিণী মুখ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহাঃ, তোমার সোনার চাঁদ বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছে? আমরা যাই আকাশে ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধ'রে এনে দিয়েছি!"

আমি বলিলাম, "তোমরা কে? তুমি আর র-বাবু?"

সুভা। না ত আবার কে? তুমি, তোমার স্বামী শ্বশুরের আর তাঁদের গাঁয়ের নাম বলিয়া দিয়াছিলে, মনে আছে? তাই শুনিয়াই র-বাবু চিনিতে পারিলেন। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মোকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল—তারই ছল করিয়া তোমার উ-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তার পর নিমন্ত্রণ।

আমি। তার পর হাত পাতিয়া বুড়ীর দালটুকু নেওয়া।

সুভা। হাঁ, সেটাও আমাদের ষড়্‌যন্ত্র।

আমি। তা, আমার পরিচয় কিছু দেওয়া হয়েছে কি?

সুভা। আ সর্ব্বনাশ! তা কি দেওয়া যায়? তোমাকে ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার পর কোথায় গিয়েছিলে, কি বৃত্তান্ত, তা কে জানে? তোমার পরিচয় পেলে কি ঘরে নেবে? বলবে একটা গতিয়ে দিচ্চে। র-বাবু বলেন, এখন তুমি নিজে যা করিতে পার।

আমি। আমি একবার কপাল ঠুকিয়া দেখিব—না হয় ডুবিয়া মরিব। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হইলে, কি করিব?

সুভা। কখন্ দেখা করবে, কোথায় বা দেখা করবে?

আমি। তোমরা যদি এত করিয়াছ, তবে এ বিষয়েও একটু সাহায্য কর। তাঁর বাসায় গেলে দেখা হইবে না,—কেই বা আমাকে নিয়ে যাবে, কেই বা দেখা করাইবে? এইখানেই দেখা করিতে হইবে।

সুভা। কখন্?

আমি। রাত্রে, সবাই শুইলে।

সুভা। অভিসারিকে?

আমি। তা বৈ আর গতি কি? দোষই বা কি—স্বামী যে।

সুভা। না, দোষ নাই। কিন্তু তাহা হইলে তাঁকে রাত্রে আটকাইতে হয়। নিকটে তাঁর বাসা; তা ঘটিবে কি? দেখি একবার র-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।

সুভাষিণী রমণ বাবুকে ডাকাইল। তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমাকে আসিয়া বলিল। বলিল, "র-বাবু যাহা পারেন, তাহা এই :—তিনি এখন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিবেন না—একটা ওজর করিয়া রাখিবেন। কাগজ দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পর সময় অবধারণ করিবেন। সন্ধ্যার পর তোমার স্বামী আসিলে, কাগজপত্র দেখিবেন। কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে একটু রাত্র করিবেন। রাত্র হইলে আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তার পর তোমার বিদ্যায় যা থাকে, তা করিও। রাত্রে থাকিতে আমরা কি বলিয়া অনুরোধ করিব ?"

আমি বলিলাম, "সে অনুরোধ তোমাদের করিতে হইবে না। আমিই করিব। আমার অনুরোধ যাহাতে শুনেন তাহা করিয়া রাখিয়াছি। দুই একটা চাহনি ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলাম, তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়াছেন। লোক ভাল নহেন। এখন আমার অনুরোধ তাঁহার কাছে পাঠাই কি প্রকারে ? একছত্র লিখিয়া দিব। সেই কাগজটুকু কেহ তাঁর কাছে দিয়ে এলেই হয়।"

সুভা। কোন চাকরের হাতে পাঠাও না ?

আমি। যদি জন্ম-জন্মান্তরেও স্বামী না পাই, তবুও পুরুষ মানুষকে এ কথা বলিতে পারি না।

সুভা। তা বটে। কোন ঝি ?

আমি। ঝি বিশ্বাসী কে ? একটা গোলমাল বাধাইবে, তখন সব খোওয়াব।

সুভা। হারাণী বিশ্বাসী।

আমি। হারাণীকে বলিয়াছিলাম। বিশ্বাসী বলিয়া সে নারাজ। তবে তোমার একটু ইঙ্গিত পাইলে সে যাইতে পারে। কিন্তু তোমায় এমন ইঙ্গিত করিতে কি প্রকারে বলিতে পারি ? মরি, ত আমি একাই মরিব।—পোড়া চোখে আবার জল আসিল।

সুভা। হারাণী আমার কথা কি বলিয়াছে ?

আমি। তুমি যদি বারণ না কর, তবে সে যাইতে পারে।

সুভাষিণী অনেকক্ষণ ভাবিল। বলিল, "সন্ধ্যার পর তাকে এই কথার জন্য আসিতে বলিও।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমাকে একজামিন দিতে হইল

সন্ধ্যার পর আমার স্বামী কাগজপত্র লইয়া রমণ বাবুর কাছে আসিলেন। সংবাদ পাইয়া, আমি আর একবার হারাণীর হাতে পায়ে ধরিলাম। হারাণী সেই কথাই বলে, "বৌদিদি যদি বারণ না করে, তবে পারি। তবে জানিব, এতে দোষ নেই।" আমি বলিলাম, "যাহা হয় কর্—আমার বড় জ্বালা।"

এই ইঙ্গিত পাইয়া হারাণী একটু হাসিতে হাসিতে সুভাষিণীর কাছে ছুটিল। আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া, আলু থালু কেশ বেশ সামলাইতে সামলাইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ছুটিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গো, এত হাসি কেন?"

হারাণী। দিদি, এমন জায়গায়ও মানুষকে পাঠায়? প্রাণটা গিয়াছিল আর কি!

আমি। কেন গো?

হারা। আমি জানি বৌদিদির ঘরে ঝাঁটা থাকে না, দরকারমত ঝাঁটা লইয়া গিয়া আমরা ঘর ঝাঁটাইয়া আসি। আজ দেখি যে, বৌদিদির হাতের কাছেই কে ঝাঁটা রাখিয়া আসিয়াছে। আমি যেমন গিয়া বলিলাম, "তা যাব কি?" অমনি বৌদিদি সেই ঝাঁটা লইয়া আমাকে তাড়াইয়া মারিতে আসিল। ভাগ্যিস্ পালাতে জানি, তাই পালিয়ে বাঁচলেম। নহিলে খেঙ্গরা খেয়ে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি? তবু এক ঘা বুঝি পিঠে পড়েছে;—দেখ দেখি দাগ হয়েছে কি না?"

হারাণী হাসিতে হাসিতে আমাকে পিঠ দেখাইল। মিছে কথা—দাগ ছিল না। তখন সে বলিল, "এখন কি করতে হবে বল—ক'রে আসি!"

আমি। ঝাঁটা খেয়ে যাবি?

হারাণী। ঝাঁটা মেরেছে—বারণ ত করে নি। আমি বলেছিলাম, বারণ না করে ত যাব।

আমি। ঝাঁটা কি বারণ না?

হারাণী। হা, দেখ দিদিমণি, বৌদিদি যখন ঝাঁটা তোলে, তখন তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখেছিলাম। তা কি করতে হবে, বল।

আমি তখন এক টুকরা কাগজে লিখিলাম,

"আমি আপনাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। গ্রহণ করিবেন কি? যদি করেন, তবে আজ রাত্রিতে এই বাড়ীতে শয়ন করিবেন। ঘরের দ্বার যেন খোলা থাকে।

সেই পাচিকা।"

পত্র লিখিয়া, লজ্জায় ইচ্ছা করিতে লাগিল, পুকুরের জলে ডুবিয়া থাকি, কি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকি। তা কি করিব? বিধাতা যেমন ভাগ্য দিয়াছেন! বুঝি আর কখন কোন কুলবতীর কপালে এমন দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

কাগজটা মুড়িয়া সুড়িয়া হারাণীকে দিলাম। বলিলাম, "একটু সবুর।" সুভাষিণীকে বলিলাম, "একবার দাদা বাবুকে ডাকিয়া পাঠাও। যাহা হয়, একটা কথা বলিয়া বিদায় দিও।" সুভাষিণী তাই করিল। রমণ বাবু উঠিয়া আসিলে, হারাণীকে বলিলাম, "এখন যা।" হারাণী গেল, কিছু পরে কাগজটা ফেরত দিল। তার এক কোণে লেখা আছে, "আচ্ছা।" আমি তখন হারাণীকে বলিলাম, "যদি এত করিলি, তবে আর একটু করিতে হইবে। দুপর রাত্রে আমাকে তাঁর শুইবার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।"

হারাণী। আচ্ছা, কোন দোষ নাই ত?

আমি। কিছু না। উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন।

হারাণী। আর জন্মে, কি এ জন্মে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "চুপ।"

হারাণী হাসিয়া বলিল, "যদি এ জন্মের হন, তবে আমি পাঁচ শত টাকা বখ্‌শিশ নিব; নহিলে আমার ঝাঁটার ঘা ভাল হইবে না।"

আমি তখন সুভাষিণীর কাছে গিয়া এ সকল সংবাদ দিলাম। সুভাষিণী শাশুড়ীকে বলিয়া আসিল, "আজ কুমুদিনীর অসুখ হইয়াছে; সে রাঁধিতে পারিবে না। সোনার মা'ই রাঁধুক।"

সোনার মা রাঁধিতে গেল—সুভাষিণী আমাকে লইয়া গিয়া ঘরে কবাট দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি, কয়েদ কেন?" সুভাষিণী বলিল, "তোমায় সাজাইব।"

তখন আমার মুখ পরিষ্কার করিয়া মুছাইয়া দিল। চুলে সুগন্ধ তৈল মাখাইয়া, যত্নে খোঁপা বাঁধিয়া দিল; বলিল, "এ খোঁপার হাজার টাকা মূল্য, সময় হইলে আমায় এ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিস্।" তার পর আপনার একখানা পরিষ্কার, রমণীমনোহর বস্ত্র লইয়া জোর করিয়া পরাইতে লাগিল। সে যেরূপ টানাটানি করিল, বিবস্ত্রা হইবার ভয়ে আমি

পরিতে বাধ্য হইলাম। তার পর আপনার অলঙ্কাররাশি আনিয়া পরাইতে আসিল। আমি বলিলাম, "এ আমি কিছুতেই পরিব না।"

তার জন্য অনেক বিবাদ বচসা হইল—আমি কোন মতেই পরিলাম না দেখিয়া সে বলিল, "তবে, আর এক সুট আনিয়া রাখিয়াছি, তাই পর।"

এই বলিয়া সুভাষিণী একটা ফুলের জার্ডিনিয়র হইতে বাহির করিয়া মল্লিকা ফুলের অফুল্ল কোরকের বালা পরাইল, তাহার তাবিজ, তাহারই বাজু, গলায় তারই দোনর মালা। তার পর এক জোড়া নূতন সোনার ইয়ার্‌রিং বাহির করিয়া বলিল, "এ আমি নিজের টাকায় র-বাবুকে দিয়া কিনিয়া আনাইয়াছি—তোমাকে দিবার জন্য। তুমি যেখানে যখন থাক, এ পরিলে আমাকে তুমি মনে করিবে। কি জানি ভাই, আজ বৈ তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়—ভগবান তাই করুন,—তাই তোমাকে আজ এ ইয়ার্‌রিং পরাইব। এতে আর না বলিও না।"

বলিতে বলিতে সুভাষিণী কাঁদিল। আমারও চক্ষে জল আসিল, আমি আর না বলিতে পারিলাম না। সুভাষিণী ইয়ার্‌রিং পরাইল।

সাজসজ্জা শেষ হইলে সুভাষিণীর ছেলেকে ঝি দিয়া গেল। ছেলেটিকে কোলে লইয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিলাম। সে একটু গল্প শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তার পর মনে একটি দুঃখের কথা উদয় হইয়াছিল, তাও এ সুখের মাঝে সুভাষিণীকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমি আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিতেছি। আমি চিনিয়াছি যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য আমি যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায়, দোষ নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এ জন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী,—তাঁহাকে মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিব না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।"

সুভাষিণী আমার কথা শুনিয়া বলিল, "তোর মত বাঁদর গাছে নেই, ওঁর যে স্ত্রী নেই।"

আমি। আমার কি স্বামী আছে না কি ?

সুভা। আ ম'লো। মেয়ে মানুষে পুরুষ মানুষে সমান। তুই কমিসেরিয়েটের কাজ ক'রে টাকা নিয়ে আয় না দেখি ?

আমি। ওরা পেটে ছেলে ধরিয়া, প্রসব করিয়া, মানুষ করুক, আমি কমিসেরিয়েটে যাইব। যে যা পারে সে তা করে। পুরুষ মানুষের ইন্দ্রিয় দমন কি এতই শক্ত ?

সুভা। আচ্ছা, আগে তোর ঘর হোক, তার পর তুই ঘরে আগুন দিস্। ও সব কথা রাখ্। কেমন ক'রে স্বামীর মন ভুলাবি, তার একজামিন দে দেখি ? তা নইলে ত তোর গতি নেই।

আমি একটু ভাবিত হইয়া বলিলাম, "সে বিদ্যা ত কখনও শিখি নাই।"

সু। তবে আমার কাছে শেখ্। আমি এ শাস্ত্রে পণ্ডিত, তা জানিস্ ?

আমি। তা ত দেখিতে পাই।

সু। তবে শেখ্। তুই যেন পুরুষ মানুষ। আমি কেমন করিয়া তোর মন ভুলাই দেখ্।

এই বলিয়া পোড়ারমুখী, মাথার একটু ঘোমটা টানিয়া, সযত্নে স্বহস্তে সুবাসিত প্রস্তুত একটি পান আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। সে পান সে কেবল রমণ বাবুর জন্য রাখে, আর কাহাকেও দেয় না। এমন কি আপনিও কখন খায় না। রমণ বাবুর আলবোলাটা সেখানে ছিল, তাহাতে কল্কে বসান; গুলের ছাই ছিল মাত্র; তাই আমার সমুখে ধরিয়া দিয়া, ফুঁ দিয়া ধরান, সুভাষিণী নাটিত করিল। তার পর, ফুল দিয়া সাজান তালবৃন্তখানি হাতে লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। হাতের বালাতে চুড়িতে বড় মিঠে মিঠে বাজিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "ভাই। এ ত দাসীপনা—দাসীপনায় আমার কতদূর বিদ্যা, তারই পরিচয় দিবার জন্য কি তাঁকে আজ ধরিয়া রাখিলাম ?"

সুভাষিণী বলিল, "আমরা দাসী না ত কি ?"

আমি বলিলাম, "যখন তাঁর ভালবাসা জন্মিবে, তখন দাসীপনা চলিবে। তখন পাখা করিব, পা টিপিব, পান সাজিয়া দিব, তামাকু ধরাইয়া দিব। এখনকার ওসব নয়।"

তখন সুভাষিণী হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বসিল। আমার হাতখানা আপনার হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া, মিঠে মিঠে গল্প করিতে লাগিল। প্রথম, প্রথম, হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, কাণবালা দোলাইয়া, সে যে সং সাজিয়াছিল,

তারই অনুরূপ কথা কহিতে লাগিল। কথায় কথায় সে ভাব ভুলিয়া গেল। সখীভাবেই কথা কহিতে লাগিল। আমি যে চলিয়া যাইব, সে কথা পাড়িল। চক্ষুতে তার এক বিন্দু জল চক চক করিতে লাগিল। তখন তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বলিলাম, "যা শিখাইলে, তা স্ত্রীলোকের অস্ত্র বটে, কিন্তু এখন উ-বাবুর উপর খাটিবে কি ?"

সুভাষিণী তখন হাসিয়া বলিল, "তবে আমার ব্রহ্মাস্ত্র শিখে নে।"

এই বলিয়া, মাগী আমার গলা বেড়িয়া হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া, আমার মুখচুম্বন করিল। এক ফোঁটা চোখের জল, আমার গালে পড়িল।

ঢোক গিলিয়া আমার চোখের জল চাপিয়া, আমি বলিলাম, "এ যে ভাই সঙ্কল্প না হতে দক্ষিণা দেওয়া শিখাইতেছিস্।"

সুভাষিণী বলিল, "তোর তবে বিদ্যা হবে না। তুই কি জানিস্, একজামিন দে দেখি। এই আমি যেন উ-বাবু" এই বলিয়া সে সোফার উপর জমকাইয়া বসিয়া,—হাসি রাখিতে না পারিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিতে লাগিল। হাসি থামিলে, একবার আমার মুখপানে খট্ মট্ করিয়া চাহিল—আবার তখনই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি থামিলে বলিল, "একজামিন দে।" তখন যে বিদ্যার পরিচয় পাঠক পশ্চাৎ পাইবেন, সুভাষিণীকেও তাহার কিছু পরিচয় দিলাম। সুভাষিণী আমাকে সোফা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা। তুই আস্ত কেউটে।"

আমি বলিলাম, "কেন ভাই ?"

সুভাষিণী বলিল, "ও হাসি চাহনিতে পুরুষ মানুষ টিকে ? মরিয়া ভূত হয়।"

আমি। তবে একজামিন পাস ?

সু। খুব পাস—কমিসেরিয়েটের এক-শ উনসত্তর পুরুষেও এমন হাসি চাহনি কখন দেখে নাই। মিন্‌সের মুণ্ডটা যদি ঘুরে যায়, ত একটু বাদামের তেল দিস্।

আমি। আচ্ছা। এখন সাড়া শব্দে বুঝিতে পারিতেছি বাবুদের খাওয়া হইয়া গেল। রমণ বাবুর ঘরে আসিবার সময় হইল, আমি এখন বিদায় হই। যা শিখাইয়াছিলে তার মধ্যে একটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল—সেই মুখচুম্বনটি। এসো আর একবার শিখি।

তখন সুভাষিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরিলাম। গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরস্পরে মুখচুম্বন করিয়া, গলা ধরাধরি করিয়া, দুই জনে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন ভালবাসা কি আর হয় ? সুভাষিণীর মত আর কি কেহ ভালবাসিতে জানে ? মরিব, কিন্তু সুভাষিণীকে ভুলিব না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা

আমি হারাণীকে সতর্ক করিয়া দিয়া আপনার শয়নগৃহে গেলাম। বাবুদের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একটা বড় গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কেহ ডাকে পাখা, কেহ ডাকে জল, কেহ ডাকে ঔষধ, কেহ ডাকে ডাক্তার। এইরূপ হুলস্থূল। হারাণী হাসিতে হাসিতে আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গণ্ডগোল কিসের ?"

হা। সেই বাবুটি মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।

আমি। তার পর ?

হা। এখন সামলেছেন।

আমি। তার পর ?

হা। এখন বড় অবসন্ন—বাসায় যাইতে পারিলেন না। এখানেই বড় বৈঠকখানার পাশের ঘরে শুইলেন।

বুঝিলাম, এ কৌশল। বলিলাম, "আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে আসিবে।"

হারাণী বলিল, "অসুখ যে গা।"

আমি বলিলাম, "অসুখ না তোর মুণ্ড। আর পাঁচ-শ খানা বিবির মুণ্ড, যদি দিন পাই।"

হারাণী হাসিতে হাসিতে গেল। পরে আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে, হারাণী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘর দেখাইয়া দিয়া আসিল। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তিনি একাই শয়ন করিয়া আছেন। অবসন্ন কিছুই না; ঘরে দুইটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, তিনি নিজের রূপরাশিতে সমস্ত আলো করিয়া আছেন। আমিও শরবিদ্ধ; আনন্দে শরীর আপ্লুত হইল।

যৌবনপ্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়মধ্যে দুপ দুপ শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি আপনি আসিয়াছ—তবে কাঁদ কেন?"

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্ম্মপীড়া হইল। তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষুর প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন, যদি মনে করেন যে, "ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য্যলোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে"—তাহা হইলে কি প্রকারে ইঁহার বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষুর জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্যান্য কথার পরে তিনি বলিলেন, "কালাদীঘি তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।"

তাঁর চক্ষের প্রতি আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, তিনি বড় বিস্ময়ের সহিত আমাকে দেখিতেছিলেন। তাঁর কথার উত্তরে আমি নেকী সাজিয়া বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব।" এই ছলক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তর। না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ?

আমি বলিলাম, "আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

উত্তর। না।

বড় বড় কথায়, উত্তর দিবার তাঁহার অবসর দেখিলাম না। আমি উপযাচিকা, অভিসারিকা হইয়া আসিয়াছি,—আমাকে আদর করিবারও তাঁর অবসর নাই। তিনি সবিস্ময়ে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। একবারমাত্র বলিলেন, "এমন রূপ ত মানুষের দেখি নাই।"

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা যেমন বড়লোক, এটি তেমনই বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পর আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমন বোধ হয় না। তাহার আর জাতি নাই বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না। আমার এবারকার নারীজন্ম বৃথা হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?"

তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দ্দয়। আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে আমি স্বামিশয্যায় বসিয়া তাঁহার অনিন্দিত মোহনমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুলের বাহির

তখন সে চিন্তিত ভাব আমার দূর হইল। ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি আমার বশীভূত হইয়াছেন। মনে মনে কহিলাম, যদি গণ্ডারের খড়্গ-প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর দন্ত-প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহা প্রয়োগ করিব। যদি কখন "মল বাজিয়ে" যেতে হয়, তবে সে এখন। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া বসিলাম। তাঁর সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আমার নিকটে আসিবেন না, আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি," [হাসিতে হাসিতে আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতে বলিতে কবরী-মোচনপূর্ব্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে?) আবার বাঁধিতে বসিলাম,] "আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে। আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সংবাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।"

বোধ হয়, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম, তোমার সঙ্গে

এই সাক্ষাৎ," এই বলিয়া আমি যেমন করিয়া চাহিতে হয়, তেমনি করিয়া চাহিতে চাহিতে, আমার কুঞ্চিত, মসৃণ, সুবাসিত অলকদামের প্রান্তভাগ, যেন অনবধানে, তাঁহার গণ্ড স্পর্শ করাইয়া সন্ধ্যার বাতাসে বসন্তের লতার মত একটু হেলিয়া, গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন, আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। মল্লিকাকোরকের বালার উপর তাঁর হাত পড়িল। তিনি হাতখানা ধরিয়া রাখিয়া যেন বিস্মিতের মত হাতের পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "দেখিতেছ কি ?" তিনি উত্তর করিলেন, "এ কি ফুল ? এ ফুল ত মানায় নাই। ফুলটার অপেক্ষা মানুষটা সুন্দর। মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর এই প্রথম দেখিলাম।" আমি রাগ কবিয়া হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, "তুমি ভাল মানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিও না।"

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাতযোড় করিয়া ডাকিলেন, "আমার কথা রাখ, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই। আর একটু দেখি। এমন আর কখন দেখিব না।" আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বসিলাম না—বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি কোন্ ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব ? ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র প্রধান ধন—এক দিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। আমি না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপনার কাছে আসিয়াছি। না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমি একেবারে অধঃপাতে যাই নাই। এখনও আমার রক্ষার পথ খোলা আছে। আমার ভাগ্য যে, সে কথা এখন আমার মনে পড়িল। আমি চলিলাম।"

তিনি বলিলেন, "তোমার ধর্ম্ম তুমি জান। আমায় এমন দশায় ফেলিয়াছ যে, আমার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আমি শপথ করিতেছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে। এক দিনের জন্য মনে করিও না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই। এক মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে কি এত হয় ?" এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বার পর্য্যন্ত আসিলাম। তখন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি দুই হস্তে আমার দুই চরণ ধরিয়া পথরোধ করিলেন। বলিলেন, "আমি যে এমন আর কখন দেখি নাই।" তাঁহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখও হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্প দূর। তাঁর গাড়ীও হাজির ছিল, এবং দ্বারবানেরা নিদ্রিত। আমরা নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তাঁর বাসায় গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম। কিন্তু দেখি তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনি ভালবাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি দ্বার খুলিলাম না; অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য সন্তাপে, দারুণ তৃষাপীড়িত রোগীকে স্বচ্ছ শীতল জলাশয়তীরে বসাইয়া দিয়া, মুখ বাঁধিয়া দাও, যেন সে জলপান করিতে না পারে—বল দেখি, তার জলে ভালবাসা বাড়িবে কি না?

অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম, দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার করগ্রহণ করিয়া বলিলাম, "প্রাণনাথ, হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।" তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম

পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোন উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল কথা বলিব। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম, তবে গত রাত্রিতে এত জ্বলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে

ফুৎকার দিলাম—কি প্রকারে স্বামীর হৃদয় দগ্ধ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে পারি না। যদি আমার কোন পাঠিকা নরহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এইরূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, স্ত্রীলোকই পৃথিবীর কণ্টক। আমাদের জাতি হইতে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে, এই নরঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকে জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবী নির্ম্মনুষ্য হইত।

এই অষ্টাহ আমি সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনি, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিতাম; খড়িকাটি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। তাঁর এতটুকু অসুখ দেখিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতাম।

এখন যুক্তকরে আপনাদের নিকট নিবেদন যে, আপনারা না মনে করেন যে, এ সকলই কৃত্রিম। ইন্দিরার মনে এতটুকু গর্ব্ব আছে যে, কেবল ভরণপোষণের লোভে, অথবা স্বামীর ধনে ধনেশ্বরী হইব, এই লোভে, সে এই সকল করিতে পারে না। স্বামী পাইব এই লোভে, কৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিতাম না; ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হইব, এমন লোভেও পারিতাম না। স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া হাসি চাহনির ঘটা ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বামীকে মোহিত করিব বলিয়া কৃত্রিম ভালবাসা ছড়াইতে পারি না। ভগবান্ সে মাটিতে ইন্দিরাকে গড়েন নাই। যে অভাগী এ কথাটা না বুঝিতে পারিবে,—যে নারকিণী আমায় বলিবে, "হাসি চাহনির ফাঁদ পাতিতে পার, খোঁপা খুলিয়া আবার বাঁধিতে পার, কথার ছলে সুগন্ধি কুঞ্চিতালকগুলি হতভাগ্য মিন্‌সের গালে ঠেকাইয়া তাকে রোমাঞ্চিত করিতে পার—আর পার না তার পাখানি তুলিয়া লইয়া টিপিয়া দিতে, কিম্বা হুঁকার ছিলিমটায় ফুঁ দিতে"!—যে হতভাগী আমাকে এমন কথা বলিবে, সে পোড়ারমুখী আমার এই জীবনবৃত্তান্ত যেন পড়ে না।

তা, তোমরা পাঁচ রকমের পাঁচ জন মেয়ে আছ, পুরুষ পাঠকদিগের কথা আমি ধরি না—তাহারা এ শাস্ত্রের কথা কি বুঝিবে—তোমাদের আসল কথাটা বুঝাইয়া বলি। ইনি

আমার স্বামী—পতিসেবাতেই আমার আনন্দ—তাই,—কৃত্রিম নহে—সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত, আমি তাহা করিতেছিলাম। মনে মনে করিতেছিলাম যে, যদি আমাকে গ্রহণ নাই করেন, তবে আমার পক্ষে পৃথিবীর যে সার সুখ,—যাহা আর কখনও ঘটে নাই, আর কখনও ঘটিতে নাও পারে, তাহা অন্ততঃ এই কয় দিনের জন্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লই। তাই প্রাণ ভরিয়া পতিসেবা করিতেছিলাম। ইহাতে কি পরিমাণে সুখী হইতেছিলাম, তা তোমরা কেহ বুঝিবে, কেহ বুঝিবে না।

পুরুষ পাঠককে দয়া করিয়া কেবল হাসি চাহনির তত্ত্বটা বুঝাইব। যে বুদ্ধি কেবল কালেজের পরীক্ষা দিলেই সীমাপ্রান্তে পৌঁছে, ওকালতিতে দশ টাকা আনিতে পারিলেই বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা বলিয়া স্বীকৃত হয়, যাহার অভাবই রাজদ্বারে সম্মানিত, সে বুদ্ধির ভিতর পতিভক্তিতত্ত্ব প্রবেশ করান যাইতে পারে না। যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষ মানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তিতত্ত্ব বুঝিবে কি? তবে হাসি চাহনির তত্ত্বটা যে দয়া করিয়া বুঝাইব বলিয়াছি, তার কারণ, সেটা বড় মোটা কথা। যেমন মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা হাতীকে বশ করে, কোচমান ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা বশ করে, রাখাল গোরুকে পাঁচনবাড়ির দ্বারা বশ করে, ইংরেজ যেমন চোখ রাঙ্গাইয়া বাবুর দল বশ করে, আমরা তেমনই হাসি চাহনিতে তোমাদের বশ করি। আমাদিগের পতিভক্তি আমাদের গুণ; আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের দোষ।

তোমরা বলিবে, এ অত্যন্ত অহঙ্কারের কথা। তা বটে—আমরাও মাটির কলসী, ফুলের ঘায়ে ফাটিয়া যাই। আমার এ অহঙ্কারের ফল হাতে হাতে পাইতেছিলাম। যে ঠাকুরটির অঙ্গ নাই, অথচ ধনুর্ব্বাণ আছে,—মা বাপ নাই,* অথচ স্ত্রী আছে—ফুলের বাণ, অথচ তাহাতে পর্ব্বতও বিদীর্ণ হয়; সেই দেবতা স্ত্রীজাতির গর্ব্বখর্ব্বকারী। আমি আপনার হাসি চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া, পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে, আবীর খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম। আমি খুন করিতে গিয়া, আপনি ফাঁসি গেলাম। বলিয়াছি, তাঁহার রূপ মনোহর রূপ—তাতে আবার জানিয়াছি, যাঁর এ রূপরাশি তিনি আমারই সামগ্রী;—

---

* আত্মযোনি।

তাহারই সোহাগে, আমি সোহাগিনী,
রূপসী তাহারই রূপে।

তার পর এই আগুনের ছড়াছড়ি। আমি হাসিতে জানি, হাসির কি উত্তোর নাই? আমি চাহিতে জানি, চাহনির কি পাল্‌টা চাহনি নাই? আমার অধরোষ্ঠ দূর হইতে চুম্বনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া থাকে, ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি খুলিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহার প্রফুল্লরক্ত-পুষ্পতুল্য কোমল অধরোষ্ঠ কি তেমনি করিয়া, ফুটিয়া উঠিয়া, পাপড়ি খুলিয়া আমার দিকে ফিরিতে জানে না? আমি যদি তাঁর হাসিতে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর চুম্বনাকাঙ্ক্ষায়, এতটুকু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম, তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরোষ্ঠবিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ। যে দেবতা, ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুব হইয়াছে।

পরীক্ষার কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু আমি তাঁহার ভালবাসার এমনই অধীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, পরীক্ষার কাল অতীত হইলে তিনি আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও যাইব না। পরিণামে যদি তিনি আমার পরিচয় পাইয়াও যদি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করেন, গণিকার মতও যদি তাঁহার কাছে থাকিতে হয়, তাহাও থাকিব, স্বামীকে পাইলে, লোকলজ্জাকে ভয় করিব না। কিন্তু যদি কপালে তাও না ঘটে, এই ভয়ে অবসর পাইলেই কাঁদিতে বসিতাম।

কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাণনাথের পক্ষচ্ছেদ হইয়াছে। আর উড়িবার শক্তি নাই। তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতিপদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিতমাত্রে স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।" ফলে আমি দেখিলাম যে, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার দশা বড় মন্দ হইবে।

পরীক্ষা ফাঁসিয়া গেল। অষ্টাহ অতীত হইলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ে উভয়ের অধীন হইলাম। তিনি আমায় কুলটা বলিয়া জানিলেন। তাহাও সহ্য করিলাম। কিন্তু আমি যাই হই, হাতীর পায়ে শিকল পরাইয়াছি, ইহা বুঝিলাম।

র। ঐ উত্তর।

উ। স্বামী জীবিত আছে?

র। আছে।

উ। আপনি তাহাকে চেনেন?

র। চিনি।

উ। ঐ স্ত্রীলোকটি এখন কোথায়?

র। আপনার এই বাড়ীতে।

স্বামী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। বিস্মিত লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

র। আমার বলিবার অধিকার নাই। আপনার জেরা কি ফুরাইল?

উ। ফুরাইল। কিন্তু আপনি ত জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, আমি কেন আপনাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম?

র। দুই কারণে জিজ্ঞাসা করিলাম না। একটি এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি বলিবেন না। সত্য কিনা?

উ। সত্য। দ্বিতীয় কারণটি কি?

র। আমি জানি যে জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

উ। তাও জানেন? কি বলুন দেখি?

র। তা বলিব না।

উ। আচ্ছা, আপনি ত সব জানেন দেখিতেছি। বলুন দেখি, আমি যে অভিসন্ধি করিতেছি, তাহা ঘটিতে পারে কি না?

র। খুব ঘটিতে পারে। আপনি কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

উ। আর একটা কথা। আপনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা সব একটা কাগজে লিখিয়া দিয়া দস্তখত করিয়া দিতে পারেন?

র। পারি—এক সর্ত্তে। আমি লিখিয়া পুলিন্দায় সীল করিয়া কুমুদিনীর কাছে দিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে তাহা পড়িতে পারিবেন না। দেশে গিয়া পড়িবেন। রাজি?

স্বামী মহাশয় অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "রাজি। আমার অভিপ্রায়ের পোষক হইবে ত?"

র। হইবে।

অন্যান্য কথার পর রমণ বাবু উঠিয়া গেলেন। উ-বাবু আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সব কথা হইতেছিল কেন?"

তিনি বলিলেন, "সব শুনিয়াছ না কি?

আমি। হাঁ শুনিয়াছি। ভাবিতেছিলাম, আমি ত তোমায় খুন করিয়া, ফাঁসি গিয়াছি। ফাঁসির পর আর তদারক কেন?

তিনি। এখনকার আইনে তা হইতে পারে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত

সেদিন, দিবারাত্রি, আমার স্বামী, অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা কহিলেন না—আমাকে দেখিলেই আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষা আমার চিন্তার বিষয় বেশী; কিন্তু তাঁকে চিন্তিত দেখিয়া, আমার প্রাণের ভিতর বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমি আপনার দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নানা প্রকার গঠনের ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, ফুলের জিনিসপত্র গড়িয়া উপহার দিলাম, পানগুলা নানা রকমের সাজিলাম, নানা রকমের সুখাদ্য প্রস্তুত করিলাম, আপনি কাঁদিতেছি, তবু নানা রসের রসভরা গল্পের অবতারণা করিলাম। আমার স্বামী বিষয়ী লোক—সর্ব্বাপেক্ষা বিষয় কর্ম্ম ভালবাসেন; তাহা বিচার করিয়া বিষয় কর্ম্মের কথা পাড়িলাম; আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, বিষয় কর্ম্ম না বুঝিতাম, এমন নহে। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার কান্নার উপর আরও কান্না বাড়িল।

পরদিন প্রাতে, স্নানাহ্নিকের পর জলযোগ করিয়া, তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বোধ করি, যা জিজ্ঞাসা করিব, সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিবে?"

তখন রমণ বাবুকে জেরা করার কথাটা মনে পড়িল। বলিলাম, "যাহা বলিব, সত্যই বলিব। কিন্তু সকল কথার উত্তর না দিতে পারি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী জীবিত আছেন, শুনিলাম। তাঁর নাম ধাম প্রকাশ করিবে?"

আমি। এখন না। দিন কত যাক্।

তিনি। তিনি এখন কোথায় আছেন বলিবে ?

আমি। এই কলিকাতায়।

তিনি। (একটু চমকিত হইয়া) তুমি কলিকাতায়, তোমার স্বামী কলিকাতায়, তবে তুমি তাঁর কাছে থাক না কেন ?

আমি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।

পাঠক দেখিও, আমি সব সত্য বলিতেছি। আমার স্বামী এই উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "স্ত্রী পুরুষে পরিচয় নাই ? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা।"

আমি। সকলের কি থাকে ? তোমার কি আছে ?

একটু অপ্রতিভ হইয়া তিনি বলিলেন, "সে ত কতকগুলা দুর্দ্দৈবে ঘটিয়াছে।"

আমি। দুর্দ্দৈব সর্ব্বত্র আছে।

তিনি। যাক্—তিনি ভবিষ্যতে তোমার উপর কোন দাবি দাওয়া করিবার সম্ভাবনা আছে কি ?

আমি। সে আমার হাত। আমি যদি তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিই, তবে কি হয় বলা যায় না।

তিনি। তবে তোমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি কি পরামর্শ দাও শুনি।

আমি। বল দেখি।

তিনি। আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।

আমি। বুঝিলাম।

তিনি। বাড়ী গেলে শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।

আমি। তাও শুনিতেছি।

তিনি। তোমাকে ফেলিয়া যাইতেও পারিব না। তা হ'লে মরিয়া যাইব।

প্রাণ আমার কণ্ঠাগত, তবু আমি এক রাশি হাসি হাসিয়া বলিলাম, "পোড়া কপাল ! ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি ?"

তিনি। কোকিলের দুঃখ কাকে যায় না। আমি তোমাকে লইয়াই যাইব।

আমি। কোথায় রাখিবে ? কি পরিচয়ে রাখিবে ?

তিনি। একটা ভারি জুয়াচুরি করিব। তাই কাল সমস্ত দিন ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে কথা কহি নাই।

আমি। বলিবে যে, এই ইন্দিরা—রামরাম দত্তের বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইয়াছি।

তিনি। আ সর্ব্বনাশ! তুমি কে?

স্বামী মহাশয়, নিস্পন্দ হইয়া, দুই চক্ষের তারা উপর দিকে তুলিয়া, আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কি হইয়াছে?"

তিনি। ইন্দিরা নাম জানিলে কি প্রকারে? আর আমার মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা জানিলে কি প্রকারে? তুমি মানুষ, না কোন মায়াবিনী?

আমি। সে পরিচয় পশ্চাৎ দিব। এখন আমি তোমাকে পাল্‌টা জেরা করিব, স্বরূপ উত্তর দাও।

তিনি। (সভয়ে) বল।

আমি। সে দিন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, তোমার স্ত্রীকে পাওয়া গেলেও তুমি গ্রহণ করিবে না; কেন না, তাহাকে ডাকাতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; তোমার জাতি যাইবে। আমাকে ইন্দিরা বলিয়া ঘরে লইয়া গেলে সে ভয় নাই কেন?

তিনি। সে ভয় নাই? খুবই আছে। তবে তাহাতে আমার প্রাণের দায় ছিল না—এখন আমার প্রাণ যায়—জাতি বড়, না প্রাণ বড়? আর সেটাও তেমন বিষম সঙ্কট নয়। ইন্দিরা যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা কেহ বলে না। কালাদীঘিতে যাহারা ডাকাতি করিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িয়াছে। তাহারা একরার করিয়াছে। একরারে বলিয়াছে, ইন্দিরার গহনাগাঁটি মাত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। কেবল এখন সে কোথায় আছে, কি হইয়াছে, তাই কেহ জানে না; পাওয়া গেলে একটা কলঙ্কশূন্য বৃত্তান্ত অনায়াসেই তৈয়ার করিয়া বলা যাইতে পারে। ভরসা করি, রমণ বাবু যাহা লিখিয়া দিবেন, তাহাতে তাহার পোষকতা করিবে। তাতেও যদি কোন কথা উঠে, গ্রামে কিছু সামাজিক দিলেই গোল মিটিবে। আমাদের টাকা আছে—টাকায় সবাইকে বশীভূত করা যায়।

আমি। যদি সে আপত্তি কাটে, তবে আর আপত্তি কি?

তিনি। গোল তোমাকে লইয়া। তুমি জাল ইন্দিরা, যদি ধরা পড়?

আমি। তোমাদের বাড়ীতে আমাকেও কেহ চেনে না, আসল ইন্দিরাকেও কেহ চেনে না; কেন না, কেবল একবার বালিকাবয়সে তাহাকে তোমরা দেখিয়াছিলে, তবে ধরা পড়িব কেন?

তিনি। কথায়। নূতন লোক গিয়া জানা লোক সাজিলে সহজে কথায় ধরা পড়ে।

আমি। তুমি না হয়, আমাকে সব শিখাইয়া পড়াইয়া রাখিবে।

তিনি। তা ত মনে করিয়াছি। কিন্তু সব কথা ত শিখান যায় না। মনে কর, যদি যে কথা শিখাইতে মনে হয় নাই, এমন কথা পড়ে, তবে ধরা পড়িবে। মনে কর, যদি কখন আসল ইন্দিরা আসিয়া উপস্থিত হয়, উভয়ের মধ্যে বিচারকালে, পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসাবাদ হইলে তুমিই ধরা পড়িবে।

আমি একটু হাসিলাম। এমন অবস্থায় হাসিটা আপনি আসে। কিন্তু এখন আমার প্রকৃত পরিচয় দিবার সময় হয় নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমায় কেহ ঠকাইতে পারে না। তুমি এইমাত্র আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে, আমি মানুষী কি মায়াবিনী। আমি মানুষী নহি, (তিনি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন) আমি কি, তাহা পরে বলিব। এখন ইহাই বলিব যে, আমাকে কেহ ঠকাইতে পারে না।"

স্বামী মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ কর্ম্মঠ লোক। নহিলে এত অল্প দিনে এত টাকা রোজগার করিতে পারিতেন না। মানুষটা বাহিরে একটু নীরস,—কাঠ কাঠ রকম, পাঠক তাহা বুঝিয়া থাকিবেন—কিন্তু ভিতরে বড় মধুর, বড় কোমল, বড় স্নেহশালী ;—কিন্তু রমণ বাবুর মত, এখনকার ছেলেদের মত, "উচ্চ শিক্ষায়" শিক্ষিত নহেন। তিনি ঠাকুর দেবতা খুব মানিতেন। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, ভূত প্রেত, ডাকিনী যোগিনী, যোগী মায়াবিনী প্রভৃতির গল্প শুনিয়াছিলেন। সে সকল একটু বিশ্বাস করিতেন। তিনি আমার দ্বারা যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার এই সময়ে স্মরণ হইল ; যাহাকে আমার অসাধারণ বুদ্ধি বলিতেন, তাহাও স্মরণ হইল ; যাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও স্মরণ হইল। অতএব আমি যে বলিলাম, আমি মানুষী নহি, তাহাতে তাঁহার একটু বিশ্বাস হইল। তিনি কিছু কাল স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তার পর নিজ বুদ্ধিবলে, সে বিশ্বাসটুকু দূর করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কেমন মায়াবিনী, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি ?"

আমি। জিজ্ঞাসা কর।

তিনি। আমার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা, জান। তার বাপের নাম কি ?

আমি। হরমোহন দত্ত।

তিনি। তাঁর বাড়ী কোথায় ?

আমি। মহেশপুর।

তিনি। তুমি কে !!!

আমি। তা ত বলিয়াছি যে, পরে বলিব। মানুষ নই।

তিনি। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার বাপের বাড়ী কালাদীঘি। কালাদীঘির লোক, এ সকল জানিলে জানিতে পারে। এইবার বল—হরমোহন দত্তের বাড়ীর সদর দরওয়াজা কোন্ মুখ?

আমি। দক্ষিণমুখ। একটা বড় ফটকে দুই পাশে দুইটা সিংহী।

তিনি। তাঁর কয় ছেলে?

আমি। এক।

তিনি। নাম কি?

আমি। বসন্তকুমার।

তিনি। তার কয় ভগিনী?

আমি। আপনার বিবাহের সময় দুইটি ছিল।

তিনি। নাম কি?

আমি। ইন্দিরা আর কামিনী।

তিনি। তাঁর বাড়ীর নিকট কোন পুকুর আছে?

আমি। আছে। নাম দেবীদীঘি। তাতে খুব পদ্ম ফুটে।

তিনি। হাঁ, তা দেখিয়াছিলাম। তুমি কখন মহেশপুরে ছিলে? তার বিচিত্র কি? তাই এত জান। আর গোটা কতক কথা বল দেখি। ইন্দিরার বিবাহে সম্প্রদান কোথায় হয়?

আমি। পূজার দালানের উত্তরপশ্চিম কোণে।

তিনি। কে সম্প্রদান করে?

আমি। ইন্দিরার খুড়া কৃষ্ণমোহন দত্ত।

তিনি। স্ত্রী আচারকালে এক জন আমার বড় জোরে কাণ মুলিয়া দিয়াছিল। তার নাম আমার মনে আছে। বল দেখি তার নাম?

আমি। বিন্দু ঠাকুরাণী—বড় বড় চোখ, রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট। নাকে ফাঁদি নথ।

তিনি। ঠিক। বোধ হয়, তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে। তাদের কুটুম্ব নও ত?

আমি। কুটুম্বের মেয়ে, চাকরাণী, কি রাঁধুনীর মেয়ের জানা সম্ভব নয়, এমন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কর না।

তিনি। ইন্দিরার বিবাহ কবে হইয়াছিল ?

আমি। —সালে বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

তিনি চুপ করিয়া ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "আমায় অভয় দাও, আমি আর দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

আমি। অভয় দিতেছি। বল।

তিনি। বাসরঘরে সকলে উঠিয়া গেলে, আমি ইন্দিরাকে নির্জ্জনে একটি কথা বলিয়াছিলাম, সে তাহার উত্তর দিয়াছিল। কি কথা সে, বল দেখি ?

বলিতে আমার একটু বিলম্ব হইল। কারণ সে কথাটা মনে করিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছিল, আমি তাহা সামলাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "এইবার বোধ হয় ঠকিলে। বাঁচিলাম—তুমি মায়াবিনী নয়।" আমি চক্ষের জল চক্ষের ভিতরে ফেরত দিয়া বলিলাম, "তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'বল দেখি আজ তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হইল ?' ইন্দিরা বলিল, 'আজ হইতে তুমি আমার দেবতা হইলে, আমি তোমার দাসী হইলাম।' এই ত গেল একটা প্রশ্ন। আর একটা কি ?"

তিনি। আর জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিতেছে। আমি বুঝি বুদ্ধি হারাইলাম। তবু বল। ফুলশয্যার দিন ইন্দিরা তামাসা করিয়া আমাকে গালি দিয়াছিল, আমিও তার কিছু সাজা দিয়াছিলাম। বল দেখি, সে কথাগুলি কি ?

আমি। তুমি ইন্দিরার হাত এক হাতে ধরিয়া, আর হাত তার কাঁধে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'ইন্দিরে, বল দেখি আমি তোমার কে ?' তাতে ইন্দিরা উত্তর করিয়াছিল, 'শুনিয়াছি, তুমি আমার ননদের বর।' তুমি দণ্ডস্বরূপ তার গালে একটা ঠোনা মারিয়া, তাকে একটু অপ্রতিভ দেখিয়া পরিশেষে মুখচুম্বন করিয়াছিলে। বলিতে বলিতে আমার শরীর অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইল—সেই আমার জীবনের প্রথম মুখচুম্বন। তার পর সুভাষিণীকৃত সেই সুধাবৃষ্টি। ইহার মধ্যে ঘোরতর অনাবৃষ্টি গিয়াছে। হৃদয় শুকাইয়া মাঠ ফাটা হইয়াছিল।

এই কথা ভাবিতেছিলাম, দেখিলাম, স্বামী, ধীরে ধীরে, বালিসের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিলেন। আমি বলিলাম, "আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?"

তিনি বলিলেন, "না। হয় তুমি স্বয়ং **ইন্দিরা,** নয় কোন মায়াবিনী।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাধরী

দেখিলাম, এক্ষণে অনায়াসে আত্মপরিচয় দিতে পারি। আমার স্বামীর নিজ মুখ হইতে আমার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে, আমি পরিচয় দিব না, স্থির করিয়াছিলাম। তাই বলিলাম, "এখন আত্মপরিচয় দিব। কামরূপে আমার অধিষ্ঠান। আমি আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে তাঁহার পার্শ্বে থাকি। লোকে আমাদিগকে ডাকিনী বলে, কিন্তু আমরা ডাকিনী নই। আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলাম, সেই জন্য অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া এই মানবীরূপ ধারণ করিয়াছি। পাচিকাবৃত্তি এবং কুলটাবৃত্তিও ভগবতীর শাপের ভিতর। তাই এ সকলও অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি জগন্মাতাকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন যে, মহাভৈরবীদর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "মহাভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে, তোমার শ্বশুরবাড়ীর উত্তরে। সে তাঁদেরই ঠাকুরবাড়ী, বাড়ীর গায়ে, খিড়্‌কি দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। চল, মহেশপুরে যাই।"

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে। কুমুদিনী যদি ইন্দিরা, তাহা হইলে কি সুখ। পৃথিবীতে তাহা হইলে আমার মত সুখী কে ?"

আমি। যেই হই, মহেশপুর গেলেই সব গোল মিটিবে।

তিনি। তবে চল, কাল এখান হইতে যাত্রা করি। আমি তোমাকে কালাদীঘি পার করিয়া দিয়া মহেশপুরে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে আপাততঃ বাড়ী যাইব। দুই একদিন সেখানে থাকিয়া আমি মহেশপুর যাইব। যোড়হাতে তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি যে, তুমি ইন্দিরাই হও, আর কুমুদিনীই হও, আর বিদ্যাধরী হও, আমাকে ত্যাগ করিও না।

আমি। না। আমার শাপান্ত হইলেও দেবীর কৃপায় আবার তোমায় পাইতে পারিব। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু।

"এ কথাটা ত ডাকিনীর মত নহে।" এই বলিয়া তিনি সদরে গেলেন। সেখানে লোক আসিয়াছিল। লোক আর কেহ নহে, রমণ বাবু। রমণ বাবু, আমার স্বামীর সঙ্গে

অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে সীল-করা পুলিন্দা দিয়া গেলেন। আমার স্বামীকে সে সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপদেশ দিলেন। শেষ বলিলেন, "সুভাষিণীকে কি বলিব ?"

আমি বলিলাম, "বলিবেন, কাল আমি মহেশপুর যাইব। গেলেই আমি শাপ হইতে মুক্ত হইব।"

স্বামী বলিলেন, "আপনাদের এ সব জানা আছে না কি ?"

চতুর রমণ বাবু বলিলেন, "আমি সব জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী সুভাষিণী সব জানেন।"

বাহিরে আসিয়া স্বামী মহাশয় রমণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ডাকিনী যোগিনী বিদ্যাধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন ?"

রমণ বাবু রহস্যখানা কতক বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "করি। সুভাষিণী বলেন, কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যাধরী।"

স্বামী বলিলেন, "কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রমণ বাবু আর দাঁড়াইলেন না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাধরীর অন্তর্দ্ধান

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইলে পর আমরা যথাকালে উভয়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া দিয়া নিজালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গের লোকজন আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এস্থানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পরে বলিব।"

সময়ান্তরে স্থূল কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম, কিন্তু সব কথা নহে। এতটুকু বুঝিতে দিলাম যে, পরিশেষে আমি স্বামীর নিকটেই ছিলাম এবং স্বামীর নিকট হইতেই আসিয়াছি। এবং তিনিও দুই একদিনের মধ্যে এখানে আসিবেন। সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম। কামিনী আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। বড় রঙ্গ ভালবাসে। সে বলিল, "দিদি! যখন মিত্রজা এত বড় গোবরগণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?" আমি বলিলাম, "আমারও সেই ইচ্ছা।" তখন দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম। সকলকে শিখাইয়া ঠিক করিলাম। বাপ মাকেও একটু শিখাইতে হইল। কামিনী তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে, প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয় নাই। সেটা এইখানে হইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব। তবে আমি যে এখানে আসিয়াছি, এই কথাটা তাঁহারা, জামাতা আসিলে তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন।

পরদিন, সে জামাতা আসিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর-অপেক্ষা করিলেন। আমি আসিয়াছি, এ কথা বাহিরে কাহারও মুখে তিনি শুনিলেন না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। যখন অন্তঃপুরে জলযোগ করিতে আসিলেন, তখন বড় বিষণ্ণবদন।

জলযোগের সময়, আমি সম্মুখে রহিলাম না। কামিনী বসিল, আর দুই চারি জন জ্ঞাতি ভগিনী ভাইজ বসিল। তখন সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কামিনী অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; তিনি যেন কলে উত্তর দিতে লাগিলেন। আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিতে দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে তিনি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদি কোথায়?"

কামিনী খুব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি কোথায়? কালাদীঘিতে সেই যে সর্ব্বনাশটা হইয়া গেল, তার পর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।"

তাঁর মুখখানা বড় লম্বা হইয়া গেল। কথা আর কহিতে পারেন না। বুঝি কুমুদিনীকে হারাইলাম, এ কথা মনে করিয়া থাকিবেন; কেন না, তাঁর চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

চক্ষের জল সামলাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমুদিনী বলিয়া, কোন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল কি?"

কামিনী বলিল, "কুমুদিনী কি কে তাহা বলিতে পারি না, একটা স্ত্রীলোক পরশু দিন পাল্কী করিয়া আসিয়াছিল বটে। সে বরাবর মহাভৈরবীর মন্দিরে গিয়া উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল।"

প্রাণনাথ জলযোগ ত্যাগ করিলেন। হাত ধুইয়া মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণের পর বলিলেন, "যে স্থান হইতে কুমুদিনী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না?"

কামিনী বলিল, "পাও বৈকি? অন্ধকার হয়েছে—আলো নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—"আগে তুই যা। তার পর আলো নিয়ে উপেন্দ্র বাবুকে লইয়া যাইব।" আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারেণ্ডায় বসিয়া রহিলাম।

সেইখানে আলো ধরিয়া (খিড়কী দিয়া পথ আছে বলিয়াছি) কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়া আমার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, "কুমুদিনী, কুমুদিনী। যদি আসিয়াছ—ত আর আমায় ত্যাগ করিও না।"

তিনি বার দুই চারি এই কথা বলার পর, কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি! উঠে আয়। ও মিন্‌সে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।"

তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! দিদি কে?"

কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি—ইন্দিরে। কখনও নাম শোন নি?"

এই বলিয়া দুষ্টা কামিনী আলোটা নিবাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। আমরা খুব ছুটিয়া আসিলাম। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেই আমাদের পিছু পিছু ছুটিলেন। কিন্তু অন্ধকার—পথ অচেনা; একটা চৌকাট বাধিয়া একটা ছোট রকম আছাড় খাইলেন। আমরা নিকটেই ছিলাম, দুই জনে দুই দিক্ হইতে হাত ধরিয়া তুলিলাম। কামিনী চুপি চুপি বলিল, "আমরা বিদ্যাধরী—তোমার রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি।"

এই বলিয়া, তাঁকে টানিয়া আনিয়া আমার শয্যাগৃহে উপস্থিত করিলাম। সেখানে আলো ছিল। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এ কি? এ ত কামিনী, আর এ ত

কুমুদিনী।" কামিনী রাগে দশখানা হইয়া বলিল, "আঃ পোড়া কপাল। এই বুদ্ধিতে টাকা রোজগার করেছ? কোদাল পাড় নাকি? এ কুমুদিনী না,—ইন্দিরে—ইন্দিরে—ইন্দিরে !!! তোমার পরিবার! আপনার পরিবার চিনতে পার না?"

তখন স্বামী মহাশয় আহ্লাদে অজ্ঞান হইয়া আমাকে কোলে টানিয়া লইতে গিয়া কামিনীকেই কোলে টানিয়া লইলেন। সে তাঁর গালে এক চড় মারিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সে দিনের আহ্লাদের কথা বলিয়া উঠিতে পারি না। বাড়ীতে খুব উৎসব বাধিল। সেই রাত্রে কামিনীতে আর উ-বাবুতে প্রায় এক শত বার বাগ্‌যুদ্ধ হইল। সকল বারই প্রাণনাথ হারিলেন।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সেকালে যেমন ছিল

কালাদীঘির ডাকাইতির পর আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্বামী মহাশয় এক্ষণে আমার কাছে সব শুনিলেন। রমণ বাবু ও সুভাষিণী যেরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাও শুনিলেন। একটু রাগও করিলেন। বলিলেন, "আমাকে এত ঘুরাইবার ফিরাইবার প্রয়োজনটা কি ছিল?" প্রয়োজনটা কি ছিল, তাহাও বুঝাইলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কামিনী সন্তুষ্ট হইল না। কামিনী বলিল, "তোমায় ঘানিগাছে ঘুরায় নাই, অমনি ছাড়িয়াছে, এইটুকু দিদির দোষ। আবার আব্‌দার নিলেন কিনা, গ্রহণ করব না! আরে মিন্‌সে, যখন আমাদের আল্‌তা-পরা শ্রীপাদপদ্মখানি ভিন্ন তোমার জেতের গতিমুক্তি নাই, তখন অত বড়াই কেন?"

উ-বাবু এবার একটা উতোর মারিলেন, বলিলেন, "তখন চিনিতে পারি নে যে! তোমাদের কি চিনতে জোওয়ায়?"

কামিনী বলিল, "তুমি যে চিনিবে, বিধাতা তা কপালে লিখেন নাই। যাত্রায় শোন নি? বলে,

ধবলী বলিল শ্যাম, কে চেনে তোমারে।
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে॥

পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কাণে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তায়, গোরু কি তা জানে?

আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। উ-বাবু অপ্রতিভ হইয়া কামিনীকে বলিলেন, "যা ভাই, আর আলাস্ নে! যাত্রা করলি, তার জন্য এই পানের খিলিটা প্যালা নিয়ে যা।"

কামিনী বলিল, "ও দিদি! মিত্রজার একটু বুদ্ধিও আছে দেখিতে পাই।"

আমি। কি বুদ্ধি দেখিলি?

কামিনী। বাবু পানের ঠিলিটা রেখে খিলিটা দিয়েছেন, বুদ্ধি নয়? তা তুই এক কাজ করিস্; মধ্যে মধ্যে তোর পায়ে হাত দিতে দিস্,—তা হলে হাত দরাজ হবে।

আমি। আমি কি ওঁকে পায়ে হাত দিতে, দিতে পারি? উনি হলেন আমার পতিদেবতা।

কামিনী। দেবতা কবে হলেন? পতি যদি দেবতা, তবে এত দিন ত তোমার কাছে উনি উপদেবতাই ছিলেন।

আমি। দেবতা হয়েছেন, যবে ওঁর বিদ্যাধরী গিয়েছে।

কামিনী। আহা, বিদ্যাকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারলেন না! তা দেখ মিত্র মহাশয়, তোমার যে বিদ্যা, তাহার সঙ্গে ধরাধরি না থাকিলেই ভাল। সে বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

আমি। কামিনী, তুই বড় বাড়ালি! শেষ চুরি চামারি পর্য্যন্ত ঘাড়ে ফেলিতেছিস্?

কামিনী। অপরাধ আমার? যখন মিত্র মহাশয় কমিসেরিয়েটের কাজ করেছেন, তখন চুরি ত করেছেন। আর চামারি;—তা যখন রসদ যুগিয়েছেন, তখন চামারিও করেছেন।

উ-বাবু বলিলেন, "বলুক গে ছেলেমানুষ। অমৃতং বালভাষিতং।"

কামিনী। কাজেই। তুমি যখন বিদ্যাধরী শাসিতং, তখন তোমার বুদ্ধি নাশিতং। আমি তবে আসিতং—মা ডাকিতং।

বাস্তবিক মা ডাকিতেছিলেন।

কামিনী মার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জান, কেন মা ডাকিতং? তোমরা আর দুদিন থাকিতং—যদি না থাকিতং, তবে জোর ক'রে রাখিতং।"

আমরা পরস্পরের মুখপানে চাহিলাম।

কামিনী বলিল, "কেন পরস্পর ডাকিতং ?"

উ-বাবু বলিলেন, "ভাবিতং।"

কামিনী বলিল, "বাড়ী গিয়া ভাবিতং। এখন দুই দিন এখানে খাবিতং, দাবিতং, হাসিতং, খুসিতং, খেলিতং, ধূলিতং, হেলিতং, দুলিতং, নাচিতং, গায়িতং—"

উ-বাবু বলিলেন, "কামিনী, তুই নাচবি ?"

কামিনী। দূর, আমি কেন ? আমি যে শিকল কিনে রেখেছি—তুমি নাচবে।

উ-বাবু। আমাকে ত আমা পর্য্যন্ত নাচাচ্চ; আর কত নাচাবে—আজ তুমি একটু নাচবে।

কামিনী। তা হলে থাকিবে ?

উ-বাবু। থাকিব।

কামিনীর নাচ দেখিবার প্রত্যাশায় নহে, আমার পিতা মাতার অনুরোধে উ-বাবু আর এক দিন থাকিতে সম্মত হইলেন। সেদিনও বড় আনন্দে গেল। দলে দলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া, সন্ধ্যার পর আমার স্বামীকে ঘেরিয়া লইয়া মজলিস্ করিয়া বসিল। সেই প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে মেয়েদের মজলিস্ হইল।

কত মেয়ে আসিল, তার সংখ্যা নাই। কত বড় বড় পটোল-চেরা ভ্রমর-তারা চোখ, সারি বাঁধিয়া, স্বচ্ছ সরোবরে সফরীর মত খেলিতে লাগিল; কত কালো কালো কুণ্ডলীকরা ফণাধরা অলকারাশি বর্ষাকালে বনের লতার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া, দুলিয়া উঠিতে লাগিল,—যেন কালিয়দমনে কালনাগিনীর দল, বিত্রস্ত হইয়া যমুনার জলে ঘুরিতে ফিরিতেছে—কত কাণ, কাণবালা, চৌদান, মাকড়ি, ঝুমকা, ইয়ার্রিং, দুল—মেঘ-মধ্যে বিদ্যুতের মত, কত মেঘের মত চুলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল,—কত রাঙ্গা ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্তির মত দন্তশ্রেণীতে কত সুগন্ধি-তাম্বুল চর্ব্বণে কত রকম অধর-লীলার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল;—কত প্রৌঢ়ার ফাঁদিনথের ফাঁদে কন্দর্পঠাকুর ধরা পড়িয়া, তীরন্দাজিতে জবাব দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন—কত অলঙ্কাররাশিভূষিত সুগোল বাহুর উৎক্ষেপনিক্ষেপে বায়ুসন্তাড়িত পুষ্পিত লতাপূর্ণ উদ্যানের মত সেই কক্ষ একটা অলৌকিক চঞ্চল শোভায় শোভিত হইতে লাগিল, রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু শিঞ্জিতে ভ্রমরগুঞ্জন অনুকৃত হইতে লাগিল; কত চিকে চিক্ চিক; হারে বাহার; চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার; মলের ঝলমলে চরণ টলমল্! কত বানারসী, বালুচরী, মুজাপুরী, ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা,—চেলি, গরদ, সূতা,—রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে, ফুর্‌ফুরে, ঝুর্‌ঝুরে, বাঁহুরে—তাতে

কারও ঘোমটা, কারও আড়ঘোমটা, কারও আধঘোমটা,—কারও কেবল কবরীপ্রান্তে মাত্র বসনসংস্পর্শ—কারও তাতেও ভুল। আমার প্রাণনাথ অনেক গোরার পল্টন ফতে করিয়া ঘরে টাকা লইয়া আসিয়াছেন—অনেক কর্ণেল, জান্‌রেলের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া, লাভের অংশ ঘরে লইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এই সুন্দরীর পল্টন দেখিয়া, তিনি বিশুষ্ক—বিত্রস্ত। তোপের আগুনের স্থানে নয়নবহ্নির স্ফূর্ত্তি-কামানের কালকরালকুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জের পরিবর্ত্তে এই কালকরালকুণ্ডলীকৃত কমনীয় কেশকাদম্বিনী, বেওনেটের ঠন্‌ঠনির পরিবর্ত্তে এই অলঙ্কারের রুণ্ রুণি ; জয়ঢাকের বাদ্যের পরিবর্ত্তে আলতা-পরা পায়ে মলের ঝম্‌ঝমি। যে পুরুষ চিলিয়ানওয়ালা দেখিয়াছে—সেও হতাশ্বাস। এ ঘোর রণক্ষেত্রে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি আমাকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে ডাকিলেন—কিন্তু আমিও শিখ সেনাপতির মত, বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম—এ রণে তাঁহার সাহায্য করিলাম না।

স্থূল কথা, এই সকল মজলিস্‌গুলায় অনেক নির্লজ্জ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে জানিতাম। তাই কামিনী আর আমি গেলাম না—বাহিরে রহিলাম। দ্বার হইতে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলাম। যদি বল, যাহাতে নির্লজ্জ ব্যাপার ঘটে, তুমি তাহার বর্ণনায় কেন প্রবৃত্ত, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, আমি হিন্দুর মেয়ে, আমার রুচিতে এই সকল ব্যাপার নির্লজ্জ ব্যাপার। কিন্তু এখনকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি ; ইংরেজি রুচির বিধানমতে বিচার করিলে ইহাতে নির্লজ্জ ব্যাপার কিছুই পাওয়া যাইবে না।

বলিয়াছি, আমি ও কামিনী দুই জনে একবার একবার উঁকি মারিলাম। দেখি, পাড়ার যমুনাঠাকুরাণী সভাপত্নী হইয়া জমকাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়াইয়াছে ; রঙটা মিঠে রকম কালো ; চোক দুইটা ছোট ছোট, কিন্তু একটু ঢুলু ঢুলু, ঠোঁট দুইখানা পুরু, কিন্তু রসে ভরা ভরা। বস্ত্রালঙ্কারের বাহার—পায়ে আলতার বাহার, কালোতে রাঙ্গা, যেন যমুনাতেই জবা,—মাথায় ছেঁড়া চুলের বাহার। শরীরের ব্যাস ও পরিধি অসাধারণ দেখিয়া, আমার স্বামী তাঁহাকে "নদীরূপামহিষী" বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। মথুরাবাসীরা যমুনা নদীকে কৃষ্ণের নদীরূপা মহিষী বলিয়া থাকে, সেই কথা লক্ষ্য করিয়া উ-বাবু এই রসিকতা করিলেন। এখন আমার যমুনা দিদি কখনও মথুরা যান নাই, এত খবরও জানেন না, এবং মহিষী শব্দের অর্থটা জানেন না। তিনি মহিষী অর্থে কেবল মাদি মহিষই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্তুর সহিত আপনার শরীরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া রাগে গর গর করিতেছিলেন। প্রতিশোধার্থ তিনি আমার স্বামীর সম্মুখে আমাকে

প্রকারান্তরে "গাই" বলিলেন, এমন সময়ে আমি দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যমুনা দিদি! কি গা?"

যমুনা দিদি বলিলেন, "একটা গাই ভাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গাই কেন গা?"

কামিনী আমার পাশ হইতে বলিল, "ডেকে ডেকে যমুনা দিদির গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে। একবার পিওবে।"

হাসির চোটে সভাপত্নী মহাশয়া নিবিয়া গেলেন, কামিনীর উপর গরম হইয়া বলিলেন, "একরত্তি মেয়ে, তুই সকল হাঁড়িতে কাটি দিস্ কেন্ লো কামিনি?"

কামিনী বলিল, "আর ত কেউ তোমার ভুসি কলাই সিদ্ধ করিতে জানে না।"

এই বলিয়া কামিনী পলাইল, আমিও পলাইলাম। আবার একবার গিয়া উঁকি মারিলাম, দেখি পাড়ার পিয়ারী ঠান্‌দিদি, জাতিতে বৈদ্য—বয়স পঞ্চষষ্টি বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে—তিনি সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া ঘাঘরা পরিয়া, রাধিকা সাজিয়া আসিয়াছেন। আমার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ কৈ? কৃষ্ণ কৈ? বলিয়া সেই কামিনীকুঞ্জবন পরিভ্রমণ করিতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খোঁজ ঠান্‌দিদি?"

তিনি বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকে খুঁজি।"

কামিনী বলিল, "গোয়ালাবাড়ী যাও—এ কায়েতের বাড়ী।"

রসিকতাপ্রবীণা বলিল, "কায়েতের বাড়ীই আমার কৃষ্ণ মিলিবে।"

কামিনী বলিল, "ঠান্‌দিদি, সকল জাতেই জাত দিয়াছ নাকি?"

এখন পিয়ারী ঠাকুরাণীর এককালে তেলি অপবাদ ছিল। এই কথায়, তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কামিনীকে ব্যঙ্গচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁকে থামাইবার জন্য, যমুনা দিদিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, "রাগ কর কেন? তোমার কৃষ্ণ ঐ যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এসো—তোমায় আমায় পুলিনে দাঁড়াইয়া একটু কাঁদি।"

যমুনা ঠাকুরাণী "মহিষী" শব্দের অর্থবোধে যেমন পণ্ডিতা, "পুলিন" শব্দের অর্থবোধেও সেইরূপ। তিনি ভাবিলেন, আমি বুঝি কোন পুলিনবিহারীর কথার ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার অকলঙ্কিত সতীত্বের—(অকলঙ্কিত তাঁহার রূপের প্রভাবে)—প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছি। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "এর ভিতর পুলিন কে লো?"

কাজেই আমারও একটু রঙ্গ চড়াইতে ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, "যার গায়ে পড়িয়া যমুনা রাত্রিদিন তরঙ্গভঙ্গ করে, বৃন্দাবনে তাকে পুলিন বলে।"

আবার তরঙ্গভঙ্গে সর্ব্বনাশ করিল,—যমুনা দিদি ত কিছু বুঝিল না, রাগিয়া বলিল, "তোর তরঙ্গ ফরঙ্গকেও চিনি নে, তোর পুলিনকেও চিনি নে, তোর বেন্দাবনকে চিনি নে। তুই বুঝি ডাকাতের কাছে এত সব রঙ্গরসের নাম শিখে এসেছিস্?"

মজলিসের ভিতর রঙ্গময়ী বলিয়া আমার একজন সমবয়স্কা ছিল। সে বলিল, "অত ক্ষেপ কেন যমুনা দিদি! পুলিন বলে নদীর ধারের চড়াকে। তোমার দুধারে কি চড়া আছে?"

চঞ্চলা নামে যমুনা দিদির ভাইজ, ঘোমটা দিয়া পিছনে বসিয়াছিল, সে ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "চড়া থাকিলেও বাঁচিতাম। একটু ফরসা কিছু দেখিতে পাইতাম। এখন কেবল কালো জলের কালিন্দী কল্‌কল্ করিতেছে।"

কামিনী বলিল, "আমার যমুনা দিদিকে কেন তোরা অমন ক'রে চড়ার মাঝখানে ফেলে দিতেছিস্।"

চঞ্চলা বলিল, "বালাই! ষাট্! ঠাকুরঝিকে চড়ার মাঝখানে ফেলে দেব কেন? ওঁর ভাইয়ের পায়ে ধ'রে বলব, যেন ঠাকুরঝিকে মেঠো শ্মশানে দেন।"

রঙ্গময়ী বলিল, দুটোতে তফাৎ কি বৌ?"

চঞ্চলা বলিল, "শ্মশানে শিয়াল কুকুরের উপকার;—চড়ায় গোরু মহিষ চরে—তাদের কি উপকার?" মহিষ কথাটা বলিবার সময়ে, বৌ একবার ঘোমটা তুলিয়া ননদের উপর সহাস্যে কটাক্ষ করিল।

যমুনা বলিল, "নে, আর এক-শ বার সেই কথা ভাল লাগে না। যাদের মোষ ভাল লাগে, তারাই এক-শ বার মোষ মোষ করুক গে।"

পিয়ারী ঠান্‌দিদি কথাটায় বড় কান দেন নাই—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোষের কথা কি গা?"

কামিনী বলিল, "কোন্ দেশে তেলিদের বাড়ী মোষে ঘানি টানে, সেই কথা হচ্ছে।"

এই বলিয়া কামিনী পলাইল। বার বার সেই তেলি কথাটা মনে করিয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই—কিন্তু কামিনী কুচরিত্রা লোক দেখিতে পারিত না। পিয়ারী ঠান্‌দিদি, রাগে অন্ধকার দেখিয়া আর কথা না কহিয়া উ-বাবুর কাছে গিয়া বসিল। আমি তখন কামিনীকে ডাকিয়া বলিলাম, "কামিনী! দেখ্‌সে আয় লো! এইবার পিয়ারী কৃষ্ণ পেয়েছেন।"

কামিনী দূর হইতেই বলিল, "অনেক দিন সময় হয়েছে।"

তার পর একটা সোর গোল শুনিলাম। আমার স্বামীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—তিনি একজনকে হিন্দিতে ধমক ধামক করিতেছেন। আমরা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, এক জন দাড়িওয়ালা মোগল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; উ-বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য ধমক ধামক করিতেছেন, মোগল যাইতেছে না। কামিনী তখন দ্বার হইতে ডাকিয়া বলিল, "মিত্র মহাশয়! গায়ে কি জোর নেই?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আছে বৈকি?"

কামিনী বলিল, "তবে মোগল মিন্‌সেকে গলা ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দাও না।"

এই বলিবা মাত্র মোগল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পলায়ন করিবার সময় আমি তাহার দাড়ি ধরিলাম—পরচুলা খসিয়া আসিল। মোগল বলিল, "মরণ আর কি! তা এ বোকাটি নিয়া ঘর করিবি কি প্রকারে?" এই বলিয়া সে পলাইল। আমি দাড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যমুনা দিদিকে উপহার দিলাম। উ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

কামিনী বলিল, "ব্যাপার আর কি? তুমিই দাড়িটা পরিয়া চারি পায়ে ঘাসবনে চরিতে আরম্ভ কর।"

উ-বাবু বলিলেন, "কেন, মোগল কি জাল?"

কামিনী। কার সাধ্য এমন কথা বলে! শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী কি জাল মোগল হইতে পারে! আসল দিল্লীর আমদানি।

একটা ভারি হাসি পড়িয়া গেল। আমি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে পাড়ার ব্রজসুন্দরী দাসী একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া একটি ছেলে কোলে করিয়া উ-বাবুর কাছে গিয়া দুঃখের কান্না কাঁদিতে লাগিল। "আমি বড় গরীব; খেতে পাই না; ছেলেটি মানুষ করিতে পারি না।" উ-বাবু তাহাকে কিছু দিলেন। আমরা দুই জনে দ্বারের দুই পাশে। সে যখন দ্বার পার হয়, কামিনী তাহাকে বলিল, "ভাই ভিখারিণী! জান ত বড় মানুষের কাছে কিছু ভিক্ষা পাইলে দ্বারবান্‌দের কিছু ঘুস দিয়ে যেতে হয়?"

ব্রজসুন্দরী বলিল, "দ্বারবান্ কে?"

কামিনী। আমরা দুই জন।

ব্রজ। কত ভাগ চাও?

কামিনী। পেয়েছ কি?

ব্রজ। দশটি টাকা।

কা। তবে, আমাদের আট টাকা আট টাকা ষোল টাকা দিয়া যাও।

ব্রজ। লাভ মন্দ নয়।

কা। তা বড় মানুষের বাড়ীর ভিক্ষায় লাভালাভ ধরিতে গেলে চলিবে কেন? সময়ে অসময়ে ঘর থেকেও কিছু দিতে হয়।

ব্রজসুন্দরী বড় মানুষের স্ত্রী। ধাঁ করিয়া ষোল টাকা বাহির করিয়া দিল। আমরা সেই ষোল টাকা যমুনা ঠাকুরাণীকে দিলাম; বলিলাম, "তোমরা এই টাকায় সন্দেশ খাইও।"

স্বামী বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ততক্ষণে ব্রজসুন্দরী ছেলে পাঠাইয়া দিয়া, বানারসী পরিয়া আসিয়া বসিলেন। আবার একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

উ-বাবু বলিলেন, "এ কি যাত্রা নাকি?"

যমুনা বলিল, "তা না ত কি? দেখিতেছ না, কাহারও কালিয়দমনের পালা, কারও কলঙ্কভঞ্জনের পালা, কারও মাথুর মিলন,—কারও শুধু পালাই পালাই পালা।"

উ-বাবু। শুধু পালাই পালাই পালা কার?

যমুনা। কেন কামিনীর। কেবল পালাই পালাই তার পালা।

কামিনী কথায় সকলকে জ্বালাইতে লাগিল; পান, পুষ্প, আতর বিলাইয়া সকলকে তুষ্ট করিতেছিল। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিল, বলিল, "তুই যে বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ লা?"

কামিনী বলিল, "পালাব না ত কি তোমাদের ভয় করি না কি?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কামিনী! ভাই, তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল?"

কামিনী। কি কথা ছিল, মিত্র মহাশয়?

উ-বাবু। তুমি নাচিবে।

কা। আমি ত নেচেছি।

উ। কখন নাচলে?

কা। দুপর বেলা।

উ। কোথায় নাচলি লো?

কা। আমার ঘরের ভিতর, দোর বন্ধ ক'রে।

উ। কে দেখেছে ?

কা। কেউ না।

উ। তেমনতর ত কথা ছিল না।

কা। এমন কথাও ছিল না যে, তোমাদের সমুখে আসিয়া পেশওয়াজ পরিয়া নাচিব। নাচিব স্বীকার করিয়াছিলাম, তা নাচিয়াছি। আমার কথা রাখিয়াছি। তোমরা দেখিতে পাইলে না, তোমাদের অদৃষ্টের দোষ। এখন আমি যে শিকল কিনিয়া রাখিয়াছি, তার কি হবে ?

কামিনী যদি নাচের দায়ে এড়াইল, তবে আমার স্বামী গানের জন্য ধরা পড়িলেন। মজলিস্ হইতে হুকুম হইল তোমাকে গায়িতে হইবে। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তিনি সনদী খিয়াল গায়িলেন। শুনিয়া সে অপ্সরোমণ্ডলী হাসিল। ফরমায়েস করিল, "বদন অধিকারী কি দাশু রায়।" তাতে উ-বাবু অপটু। সুতরাং অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইল না।

এইরূপে দুই প্রহর রাত্রি কাটিল। এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এদেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে ; কেন না, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায়, এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে যাঁহারা জামাই দেখিতে পৌরস্ত্রীদিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাঁহাদের চোখ কান ফুটাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাই ধরি মাছ, না ছুঁই পানি করিয়া, তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমি পরদিন স্বামীর সঙ্গে শিবিকারোহণে শ্বশুরবাড়ী গেলাম। স্বামীর সঙ্গে যাইতেছি, সে একটা সুখ বটে, কিন্তু সেবার যে যাইতেছিলাম, সে আর এক প্রকারের সুখ। যাহা কখন পাই নাই, তাই পাইবার আশায় যাইতেছিলাম ; এখন যাহা পাইয়াছিলাম,

তাই আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। একটা কবির কাব্য, অপরটা ধনীর ধন। ধনীর ধন কবির কাব্যের সমান কি? যাহারা ধনোপার্জ্জন করিয়া বুড়া হইয়াছে, কাব্য হারাইয়াছে, তাহারাও এ কথা বলে না। তাহারা বলে, ফুল যতক্ষণ গাছে ফুটে, ততক্ষণই সুন্দর; তুলিলে আর তেমন সুন্দর থাকে না। স্বপ্ন যেমন সুখের, স্বপ্নের সফলতা কি তত সুখের হয়? আকাশ যেমন বস্তুতঃ নীল নয়, আমরা নীল দেখি মাত্র, ধন তেমনই। ধন সুখের নয়, আমরা সুখের বলিয়া মনে করি। কাব্যই সুখ। কেন না, কাব্য আশা, ধন ভোগমাত্র। তাও সকলের কপালে নয়। অনেক ধনী লোক কেবল ধনাগারের প্রহরী মাত্র। আমার একজন কুটুম্ব বলেন, "ট্রেজুরি গার্ড।"

তবু সুখে সুখেই শ্বশুরবাড়ী চলিলাম। সেখানে, এবার নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলাম। স্বামী মহাশয়, মাতাপিতার সমীপে সমস্ত কথা সবিশেষে নিবেদন করিলেন। রমণ বাবুর পুলিন্দা খোলা হইল। তাঁহার কথার সঙ্গে আমার সকল কথা মিলিল। আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন। সমাজের লোকেও সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কোন কথা তুলিল না।

আমি সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া, সুভাষিণীকে পত্র লিখিলাম। সুভাষিণীর জন্য সর্ব্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত। আমার স্বামী আমার অনুরোধে রমণ বাবুর নিকট হারাণীর জন্য পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। শীঘ্রই সুভাষিণীর উত্তর পাইলাম। উত্তর আনন্দ-পরিপূর্ণ। সুভাষিণী, র-বাবুর হস্তাক্ষরে পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু কথাগুলা সুভাষিণীর নিজের, তাহা কথার রকমেই বুঝা গেল। সে সকলেরই সংবাদ লিখিয়াছিল। দুই একটা সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সে লিখিতেছে,

"হারাণী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। বলে, আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে। এটা যেন ভাল কাজই করিয়াছিলাম, কিন্তু এ রকম কাজ ত মন্দই হয়। আমি যদি লোভে পড়িয়া মন্দেই রাজি হই? আমি পোড়ারমুখীকে বুঝাইলাম যে, আমার ঝাঁটা না খাইলে কি তুই এ কাজ করিতিস্? সবার বেলাই কি তুই আমার হাতের ঝাঁটা খেতে পাবি? মন্দ কাজের বেলা কি আমি তোকে তেমনই তোর সুধু মুখে ঝাঁটা খাওয়াইব? দুটো গালাগালিও খাবি না কি? ভাল কাজ করেছিলি, বক্‌শিষ্ নে। এইরূপ অনেক বুঝান পড়ানতে সে টাকা নিয়াছে। এখন নানা রকম ব্রত নিয়ম করিবার ফর্দ্দ করিতেছে। যত দিন না তোমার এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তত দিন সে আর হাসে নাই, কিন্তু এখন তার হাসির জ্বালায় বাড়ীর লোক অস্থির হইয়াছে।"

পাচিকা ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীর সংবাদ সুভাষিণী এইরূপ লিখিল, "যে অবধি তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে গোপনে চলিয়া গিয়াছ, সে অবধি বুড়ী বড় আস্ফালন করিত, বলিত, 'আমি বরাবর জানি সে মানুষ ভাল নয়। তার রকম সকম ভাল নয়। কতবার বলেছি যে, এমন কুচরিত্র মানুষ তোমরা রেখ না। তা, কাঙ্গালের কথা কে গ্রাহ্য করে? সবাই কুমুদিনী কুমুদিনী ক'রে অজ্ঞান।' এমনই এমনই আরও কথা। তার পর যখন শুনিল যে, তুমি আর কাহারও সঙ্গে যাও নাই, আপনার স্বামীর সঙ্গে গিয়াছ, তুমি বড় মানুষের মেয়ে, বড় মানুষের বৌ—এখন আপনার ঘর বর পাইয়াছ, তখন বলিল, 'আমি ত বরাবর বলচি মা যে, সে বড় ঘরের মেয়ে, ছোট ঘরে কি আর অমন স্বভাব চরিত্র হয়? যেমন রূপ, তেমনই গুণ, যেন লক্ষ্মী! সে ভাল থাকুক মা! ভাল থাকুক! তা, হা দেখ বৌদিদি! আমাকে কিছু পাঠাইয়া দিতে বলো'।"

গৃহিণী সম্বন্ধে সুভাষিণী লিখিল, "তিনি তোমার এই সকল সংবাদ পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে ও র-বাবুকে কিছু ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'সে যে এত বড় ঘরের মেয়ে, তা তোরা আমাকে আগে বলিস্ নে কেন? আমি তাকে খুব যত্নে রাখিতাম।' আর তোমার স্বামীরও কিছু নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'হোক্ তাঁর পরিবার, আমার অমন রাঁধুনীটা নিয়ে যাওয়া তাঁর কিছু ভাল হয় নাই'।"

কর্ত্তা রামরাম দত্তের কথা খোদ সুভাষিণীর নিজ হাতের হিজিবিজি। কষ্টে পড়িলাম যে, কর্ত্তা গৃহিণীকে কৃত্রিম কোপের সহিত তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ছল ছুতা করিয়া সুন্দর রাঁধুনীটাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ।" গৃহিণী বলিলেন, "খুব করিয়াছি, তুমি সুন্দরী নিয়ে কি ধুইয়া খাইতে?" কর্ত্তা বলিলেন, "তা কি বলতে পারি। ও কালো রূপ আর রাত দিন ধ্যান করিতে পারা যায় না।" গৃহিণী সেই হইতে শয্যা লইলেন, আর সেদিন উঠিলেন না। কর্ত্তা যে তাঁহাকে ক্ষেপাইয়াছেন, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না।

বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গের জন্য কিছু কিছু পাঠাইয়া দিলাম।

তার পর সুভাষিণীর সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। তার কন্যার বিবাহের সময়ে বিশেষ অনুরোধে, স্বামী মহাশয় আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সুভাষিণীর কন্যাকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইলাম—গৃহিণীকে উপযুক্ত উপহার দিলাম—যে যাহার যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ দান ও সম্ভাষণ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গৃহিণী আমার প্রতি ও আমার

স্বামীর প্রতি অপ্রসন্ন। তাঁর ছেলের ভাল খাওয়া হয় না, কথাটা আমায় অনেক বার শুনাইলেন। আমিও রমণ বাবুকে কিছু রাঁধিয়া খাওয়াইলাম। কিন্তু আর কখন গেলাম না। রাঁধিবার ভয়ে নয়; গৃহিণীর মনোদুঃখের ভয়ে।

গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।

সম্পূর্ণ

পাঠভেদ

'ইন্দিরা'র প্রথম ও পঞ্চম সংস্করণে এত পার্থক্য যে, পাঠভেদ দেওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ পঞ্চম সংস্করণকে সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র "পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে"ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে 'ইন্দিরা' একটি বড় গল্প মাত্র (পৃষ্ঠা ৪৫) ছিল, আমরা "পাঠভেদে" সেইটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিলাম।—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না। বলিলেন, "বিহাইকে বলিও, যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?" শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারপ্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জ্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সম্বাদ লইলেন না। যে সময়ে আমার ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে তিনি বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট্ বটে ত ?) কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জ্জনা করিবেন; হাল আইনে তাঁহাকে আমার "উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কী বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মানুষ বটে। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারিজন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মানুষ। হাসিয়া বলিলেন, "মা, ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

তাই আমি শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুর বাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর; উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ। সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে, জানিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বট গাছ। তাহার ছায়া শীতল, জল নীলমেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে একা লোক জন আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এই জন্য লোকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোলজন বাহক, চারি জন দ্বারবান, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পঁহুছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, "আমরা কিছু জল টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?" আমার সঙ্গের লোক জন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি ক্ষণেক পরে, অনুভবে বুঝিলাম যে লোক জন তফাতে গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে, এক বটবৃক্ষ তলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সে স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায়, বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারি পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণ-শোভিত "পাহাড়";—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী; পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—জলের উপরে জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদুং তরঙ্গ হিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মিপ্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গচালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দেখিলাম যে বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক—একজন শ্বশুর বাড়ীর, একজন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপরপার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিগের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, যে এক জন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য।

দেখিতে২ আর এক জন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল! দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপে চারিজন প্রায় এক কালীনই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই—পাল্কী স্কন্ধে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন হ্যায় রে! কোন হ্যায় রে" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়াইল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যু হস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে! পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোকে অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। প্রথমে ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহু সংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে বটের ডাল।

লোক সংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যে রূপ দ্রুত বেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এক জন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, এক জন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল, তখন এক জন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এই রূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নহিলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। তাহারা এক খানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া, পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্ন মাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়! সেই নিবিড় অরণ্যে, অন্ধকার রাত্রে, আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া, আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণ ভাবে বলিল, "বাছা! অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনি সোহরত হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

এক জন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া কাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না—এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দ্দার। সে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়ি এই খানে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?" তাহারা চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদিগের কথা বার্ত্তা শুনা গেল—ততক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল। তার পর সেইখানে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে। বংশপত্রাবচ্ছেদে বালারুণকিরণ ভূমে পতিত হইয়াছে। আমি গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামানুসন্ধানে গেলাম। কিছু দূর গিয়া এক খানি গ্রাম পাইলাম। আমার পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামের সন্ধান করিলাম; আমার শ্বশুরালয় যে গ্রামে, তাহারও সন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না। দেখিলাম, আমি ইহার অপেক্ষা বনে ছিলাম ভাল। একে লজ্জায় মুখ ফুটিয়া পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পারি না, যদি কষ্ট, তবে সকলেই আমাকে যুবতী দেখিয়া আমার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষ করিতে থাকে। কেহ ব্যঙ্গ করে—কেহ অপমান সূচক কথা বলে। আমি মনেং প্রতিজ্ঞা করিলাম, "এই খানে মরি, সেও ভাল; তবু আর পুরুষের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।" স্ত্রীলোকেরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না—তাহারাও আমাকে জন্তু মনে করিতে লাগিল বোধ হয়, কেননা তাহারাও বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিল। কেবল এক জন প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা? তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে রাখিয়া আইস। তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথ হাঁটিলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সে গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ। বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে দুই দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে?" সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎং চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে?" আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছ তলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।"

ছাই রূপ! ঐ রূপ, রূপ, শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে, দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত গাত্র বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে; বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গাত্রের বেদনা আরাম হইল, ততদিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকেই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না। উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্র সন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথাও পাঠাইতে পারি না।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

একদিন শুনিলাম যে ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি ইহা উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে কলিকাতায় গেলে অবশ্য আমার খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সম্বাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে আমার জানাশুনা আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।"

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা। বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথিনী আপন পিত্রালয়ে পঁহুছিতে পারে।" কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পর দিন নৌকায় উঠিলাম।

কলিকাতায় পঁহুছিলাম। কৃষ্ণদাস বাবু কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতার কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা ?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনি এক খানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। একজন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্র বিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় একজন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে ?

কৃষ্ণদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। রাম রাম দত্ত নামে আমার একজন আত্মীয় লোক ঠনঠনিয়ায় বাস করেন। কল্য তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে 'মহাশয় আমার পাচিকার অভাবে বড় কষ্ট হইতেছে। আপনাদিগের দেশের অনেক ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়ী রাঁধিয়া খায়। আমাকে একটি দিতে পারেন ?' আমি বলিয়াছি, 'চেষ্টা দেখিব।' তুমি এ কার্য্য স্বীকার কর—নহিলে তোমার উপায় দেখি না। আমার এমত শক্তি নাই যে তোমায় আবার খরচ পত্র করিয়া কাশী লইয়া যাই। আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে ? বরং এখানে থাকিলে তোমার খুড়ার সন্ধান করিতে পারিবে।"

অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল, কিন্তু রাত্রিদিন "রূপ ! রূপ !" শুনিয়া আমার কিছু ভয় হইয়াছিল। পুরুষজাতি মাত্র আমার শত্রু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"রাম রাম বাবুর বয়স কত ?"

উ। "তিনি আমার মত প্রাচীন।"

"তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান কি না ?"

উ। "দুইটি।"

"অন্য পুরুষ তাঁহার বাড়ীতে কে থাকে ?"

উ। "তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অবিনাশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।"

আমি সম্মত হইলাম। পর দিন কৃষ্ণদাস বাবু আমাকে রাম রাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাড়ী পাচিকা হইয়া রহিলাম। শেষে কপালে এই ছিল ! রাঁধিয়া খাইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমে মনে করিলাম, যে আমার বেতনের টাকা গুলি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই পিত্রালয়ে যাইতে পারিব। কিন্তু মহেশপুর কোথায়, কেহ চিনে না—এমন লোক পাইলাম না যে কোন সুযোগ করিয়া দেয়। মহেশপুর কোন জেলা, কোন দিগে যাইতে হয়, আমি কুলবধূ, এ সকলের কিছুই জানিতাম না, সুতরাং কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এই রূপে এক বৎসর রাম রাম বাবুর বাড়ীতে কাটিল। তাহার

পর একদিন অকস্মাৎ এ অন্ধকার পথে প্রদীপের আলো পড়িল, মনে হইল। শ্রাবণের রাত্রে নক্ষত্র দেখিলাম, মনে হইল।

এই সময়ে রাম রাম দত্ত আমাকে এক দিন ডাকিয়া বলিলেন, "আজ একটি বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তিনি আমার মহাজন, আমি খাদক,—আজিকার পাক শাক যেন পরিপাটি হয়। নহিলে বড় প্রমাদ হইবে।"

আমি যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল—সুতরাং আমিই পরিবেশন করিতে প্রবৃত্তা হইলাম। কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং রাম রাম বাবু আহারে বসিলেন।

আমি অগ্রে অন্নব্যঞ্জন দিয়া আসিলাম—পরে তাঁহারা আসিলেন। তাহার পর মাংস দিতে গেলাম। আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশবৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণী মনোহর বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি, আমি মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে খর দৃষ্টিতে দেখিতে ছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। পুরুষে বলিয়া থাকেন, যে অন্ধকারে প্রদীপের মত অবগুণ্ঠন মধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদায় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু সুখী হইয়া আসিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলিতে হইল—আমি নিতান্ত একটুকু সুখী হইয়া আসিলাম না। আমার নারী জন্মে প্রথম এই হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল।

এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতা মণ্ডলী আমার উপর ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "পাপিষ্ঠে, এ যে অনুরাগ।" আমি স্বীকার করিতেছি, এ অনুরাগ। কিন্তু আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল! এমন গভীর জলে ক্ষেপণী নিক্ষেপেই যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

আমি স্বীকার করিতেছি যে এ কথা বলিয়া আমি দোষ শূন্য হইতে পারিতেছি না। সকারণে হউক, আর নিষ্কারণেই হউক, পাপ সকল অবস্থাতেই পাপ। পাপের নৈমিত্তিকতা নাই। কিন্তু আমার জন্মের মধ্যে এই প্রথম পাপ ও এই শেষ পাপ।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া, আমার যেন মনে হইল, আমি ইহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমত সময়ে রামরাম বাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম, ইনি সেই কটাক্ষটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন, যে পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রামরাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, "হাঁ উনি রাঁধেন ভাল।"

আমি মনে মনে বলিলাম "তোমার মাতা আর মুণ্ড রাঁধি।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে আপনার বাড়ীতে দুই এক খানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "চিনিয়াছি।" বস্তুতঃ দুই এক খানা ব্যঞ্জন আমাদের নিজ দেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, "তা হবে; ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।"

ইনি এবার যো পাইলেন, একেবারে আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায় গা?"

আমার প্রথম সমস্যা; কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এরূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাতুর্য্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, "আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল। এখন আর একটা বলিয়া দেখি।" এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম,

"আমাদের বাড়ী কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি?"

আমি বলিলাম "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংস পাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ত্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন,

"উপেন্দ্র বাবু, আহার করুন না।" ঐটি শুনিবার আমার বাকি ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া এক বার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল?" আমি মাংসের পাত্র খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে এই ইতিবৃত্ত মধ্যে এক শত বার আমার স্বামীর উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটিতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দেও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার উল্লেখ করিব? এক শত বার "স্বামী স্বামী" করিয়া কান জ্বালাইয়া দিব? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামীকে "উপেন্দ্র" বলিতে আরম্ভ করিব? না "প্রাণ নাথ" "প্রাণ কান্ত" "প্রাণেশ্বর" "প্রাণ পতি," এবং "প্রাণাধিকের" ছড়া ছড়ি করিব? যিনি আমাদিগের সর্ব্বপ্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে২ ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (সে একটু সহর ঘেঁসা মেয়ে) স্বামীকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে "বাবুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।

মাংসপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, মনে২ স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।"

এই ভাবিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজনস্থান হইতে বহির্ব্বাটীতে গমনকালে যে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে২ বলিলাম যে, "যদি ইনি এদিক ওদিক চাহিতে২ না যান, তবে আমি এ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই।" আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিও—আমি মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অগ্রে২ রাম রাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তার পর স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারিদিগে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবা মাত্র, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক,—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয় "প্রাণনাথ" আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।

হারাণী নামে রামরাম দত্তের একজন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী মৃদু হাসিল। বলিল, "ছি! দিদি ঠাকুরুন! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয় গিরি রাখ—আমার এ উপকার করবি কি না বল্।"

হারাণী বলিল, "তোমার জন্য একাজ আমি করিব কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।"

হারাণীর নীতি শিক্ষা এইরূপ।

হারাণী স্বীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটা মাছের মত ছটফট্ করিতে লাগিলাম। চারি দণ্ড পরে হারাণী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাবুর অসুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা লইতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি জানি, যদি অপরাহ্ণে চলিয়া যান—তুই একটু নির্জ্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস্ যে আমাদের রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন।' কিন্তু রাঁধুনীর নিমন্ত্রণ, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোন ছল করিয়া থাকিবেন।" হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি!" কিন্তু দৌত্য স্বীকৃতা হইয়া গেল। হারাণী অপরাহ্ণে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা বলিয়াছি। বাবুটি ভাল মানুষ নহেন—রাজি হইয়াছেন।"

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু মনে২ তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমত কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে২ নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনে২ সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে২ কলিকাতায় আসিতেন। রামরাম দত্তের সঙ্গে তাঁহার দেনা পাওনা ছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা। অপরাহ্ণে তিনি হারাণীর কথায় স্বীকৃত হইয়া, রামরামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।" রামরাম বাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি? কিন্তু কাগজ পত্র সব আড়তে আছে, আনিতে পাঠাই। আসিতে রাত্র হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার পদার্পণ করেন—কিম্বা অদ্য অবস্থিতি করেন, তবেই হইতে পারে।" তিনি উত্তর করিলেন, "তাহার বিচিত্র কি? এ আমারই ঘর। একবারে কাল প্রাতেই যাইব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রে সকলে আহারান্তে শয়ন করিলে পর, আমি নিঃশব্দে রামরাম দত্তের বৈঠকখানায় গেলাম। তথায় আমার স্বামী একাকী শয়ন করিয়াছিলেন।

যৌবন প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামিসম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়মধ্যে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি আপনি আসিয়াছ—তবে কাঁদ কেন?"

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্ম্ম পীড়া হইল, তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষের প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন—যদি মনে করেন যে, "ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রী হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য্য লোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে"—তাহা হইলে কি প্রকারে ইহাঁর বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্যান্য কথার পরে তিনি বলিলেন, "কালাদীঘি তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমাদিগের দেশে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা এখনও আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

আমি নেকী সাজিয়া বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব।" এই ছল ক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?"

উত্তর। না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ?

আমি বলিলাম, "আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

উত্তর। না।

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা যেমন বড় লোক, এটি তেমনি বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পরে আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমত বোধ হয় না। তাহার আর জাতি নাই, বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না! আমার এবারকার নারী জন্ম বৃথায় হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?"

তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দ্দয়! আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রে আমি স্বামি-শয্যায় বসিয়া তাঁহার আনন্দিত মোহনমূর্ত্তি দেখিতে২ প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তখন সে চিন্তিতভাব আমার দূর হইল। ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে তিনি আমার হাস্য কটাক্ষের বশীভূত হইয়াছেন। মনে২ করিলাম, যদি গণ্ডারের খড়্গ প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর শুণ্ড প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখ ব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহার প্রয়োগ করিব। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া বসিলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আমার নিকটে আসিবেন না। আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি," হাসিতে২ আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতে২ কবরী মোচন পূর্ব্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে ?) আবার বাঁধিতে বসিলাম "আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে। আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সম্বাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।"

বোধ হয়, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আমি তখন হাসিতে২ বলিলাম, "তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ," এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন ; আসিয়া আমার হস্ত ধরিলেন। আমি রাগ করিয়া হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, "তুমি ভাল মানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিও না।"

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাত যোড় করিয়া ডাকিলেন, "আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই।" আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বসিলাম না—বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি কোন ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব ? ধর্ম্মই আমাদিগের এক মাত্র প্রধান উপায়—একদিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। আমি চলিলাম।"

তিনি বলিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে। এক দিনের জন্য কেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই।" এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বার পর্য্যন্ত আসিলাম। তখন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি দুই হস্তে আমার দুই চরণ ধরিয়া পথ রোধ করিলেন।

তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্পদূর, সেই রাত্রেই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম। কিন্তু দেখি তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনি ভালবাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি দ্বার খুলিলাম না। অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "প্রাণনাথ, হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।" তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোন উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল কথা বলিব। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম, তবে গত রাত্রে এত আগুন জ্বলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে ফুৎকার দিলাম—কি প্রকারে স্বামীর হৃদয় দগ্ধ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে পারি নাই। যদি আমার কোন পাঠিকা নর হত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবেই তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এই রূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, স্ত্রীলোকই পৃথিবীর কণ্টক। আমাদের জাতি হইতে পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে এই নরঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকে জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবীতে আগুন লাগিত।

এই অষ্টাহ আমি সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনী, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার

ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিলাম; খড়িকাটি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। লজ্জার কথা কহিব কি?—এক দিন একটু কাঁদিলাম; কেন কাঁদিলাম, তাহা স্পষ্ট তাঁহাকে জানিতে দিলাম না—অথচ একটু২ বুঝিতে দিলাম যে অষ্টাহ পরে পাছে বিচ্ছেদ হয়—পাছে তাঁহার অনুরাগ স্থায়ী না হয়, এই আশঙ্কায় কাঁদিতেছি। এক দিন, তাঁহার একটু অসুখ হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম। এ সকল পাপাচরণ শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সকলই কৃত্রিম নহে—আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তিনি যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুরাগী, তাহার অধিক আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে তিনি অষ্টাহ পরে আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও আমি যাইতাম না।

ইহাও বলা বাহুল্য যে তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতিপদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিতমাত্রে স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।" ফলে আমি দেখিলাম যে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার উন্মাদগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

পরীক্ষার শেষ দিন আমিও তাঁহার সঙ্গে কাঁদিলাম। বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি তোমার সঙ্গে আসিয়া ভাল করি নাই। তোমাকে বৃথা কষ্ট দিলাম। এখন আমার বিবেচনা হইতেছে, পরীক্ষা মিথ্যা ভ্রম মাত্র। মানুষের মন স্থির নয়। তুমি আট দিন আমাকে ভাল বাসিলে—কিন্তু আট মাস পরে তোমার এ ভালবাসা থাকিবে কি না, তাহা তুমিও বলিতে পার না। তুমি আমায় ত্যাগ করিলে আমার কি দশা হইবে?"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার যদি সেই ভাবনা হয়, তবে আমি তোমাকে এখনই যাবজ্জীবনের উপায় করিয়া দিতেছি। পূর্ব্বেই আমি মনে করিয়াছি, তোমার যাবজ্জীবনের সংস্থান করিয়া দিব।"

আমিও ঐ কথাই পাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; তিনি আপনি পাড়ায় আরও ভাল হইল। আমি তখন বলিলাম, "ছি! তুমি যদি ত্যাগ করিলে তবে আমি টাকা লইয়া কি করিব? ভিক্ষা করিয়া খাইলেও জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু তুমি ত্যাগ করিলে জীবন রক্ষা হইবে না। তুমি এমন কোন কাজ কর, যাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে তুমি এজন্মে আমায় ত্যাগ করিবে না। আজ শেষ পরীক্ষার দিন।"

তিনি বলিলেন, "কি করিব, বল। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম "আমি স্ত্রীলোক, কি বলিব? তুমি আপনি বুঝিয়া কর।" পরে অন্য কথা পাড়িলাম। কথায়২ একটা মিথ্যা গল্প করিলাম। তাহাতে কোন ব্যক্তি আপন উপপত্নীকে সমুদায় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল—এই প্রসঙ্গ ছিল।

তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গাড়ি প্রস্তুত হইলে কোথায় গেলেন। আট দিনের মধ্যে এই তিনি প্রথমে আমার কাছ ছাড়া হইলেন। ক্ষণেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কিছু বলিলেন না। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। অপরাহ্ণে আবার গেলেন। এবার একখানি কাগজ হাতে করিয়া আসিলেন। বলিলেন, "ইহা লও। তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলাম। উকীলের বাড়ী হইতে এই দানপত্র লেখাইয়া আনিয়াছি। যদি তোমাকে আমি কখন ত্যাগ করি, তবে আমাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।"

এবার আমার অকৃত্রিম অশ্রুজল পড়িল—তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন! আমি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, "আজি হইতে আমি তোমার চিরকালের দাসী হইলাম। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তাহার পরেই মনে২ বলিলাম, "এইবার সোণার চাঁদ, আর কোথায় যাইবে? তবে নাকি আমাকে গ্রহণ করিবে না?" যে অভিপ্রায়ে, আমার এত জাল পাতা, তাহা সিদ্ধ হইল। এখন আমি তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে।

আমার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন "ইন্দিরা"—মাতা নাম রাখিয়াছিলেন "কুমুদিনী।" শ্বশুর বাড়ীতে ইন্দিরা নামই জানিত, কিন্তু পিত্রালয়ে অনেকেই আমাকে কুমুদিনী বলিত। রাম রাম দত্তের বাড়ীতে আমি কুমুদিনী নাম ভিন্ন ইন্দিরা নাম বলি নাই। ইঁহার কাছে আমি কুমুদিনী ভিন্ন ইন্দিরা নাম প্রকাশ করি নাই। কুমুদিনী নামেই লেখা পড়া হইয়াছিল।

কিছু দিন আমরা কলিকাতায় সুখে সচ্ছন্দে রহিলাম। আমি এপর্য্যন্ত পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছা ছিল, একেবারে মহেশপুরে গিয়া পরিচয় দিব। ছলে কৌশলে স্বামীর নিকট হইতে মহেশপুরের সম্বাদ সকল জানিয়াছিলাম—সকলে কুশলে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য বড় মন ব্যস্ত হইয়াছিল।

আমি স্বামীকে বলিলাম, "আমি একবার কালাদীঘি যাইয়া পিতামাতাকে দেখিয়া আসিব। আমাকে পাঠাইয়া দাও।"

স্বামী ইহাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কি প্রকারে থাকিবেন? কিন্তু এদিকে আমার আজ্ঞাকারী, "না" বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কালাদীঘি যাইতে আসিতে এখান হইতে পনের দিনের পথ; এতদিন তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম, "আমিও তাই চাই। কিন্তু তুমি কালাদীঘি গিয়া কোথায় থাকিবে?"

তিনি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কালাদীঘিতে কতদিন থাকিবে?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে পাঁচদিনের বেশী থাকিব না।"

তিনি বলিলেন, "সেই পাঁচদিন আমি বাড়ীতে থাকিব। পাঁচদিনের পর তোমাকে কালাদীঘি হইতে লইয়া আসিব।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইলে পর আমরা যথাকালে উভয়ে শিবিকারোহণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া গ্রামের মধ্য পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া নিজালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি পশ্চাৎ ফিরিলে, আমি বাহকদিগকে বলিলাম, "আমি আগে মহেশপুর যাইব—তাহার পর কালাদীঘি আসিব। তোমরা আমাকে মহেশপুর লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

তাহারা আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এস্থানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পরে বলিব।"

পর দিন পিতা আমার শ্বশুর বাড়ী লোক পাঠাইলেন। পত্রবাহককে বলিয়া দিলেন, "জামাতা যদি বাড়ী না থাকেন, তবে যেখানে থাকেন, সেইখানে গিয়া এই পত্র দিয়া আসিবি।"

আমি মাতাকে বলিলাম, "আমি আসিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে জানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি, তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।"

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরমাত্মীয়, আর সদ্বিবেচক। অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।" তিনি পত্র পাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি পূজ্য ব্যক্তি। যে ছলেই হউক, এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শনলাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এতদিন গৃহে ছিলেন না—কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাঁহাকে আমি গ্রহণ করিব না।"

পিতা মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কাদিগকে বলিলাম, "তোমরা উঁহাদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। উঁহাকে একবার অন্তঃপুরে আন—তাহা হইলেই আমি উঁহাকে গ্রহণ করাইব।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, "আমি যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণও করিব না।" শেষে মাতার রোদন এবং আমার সমবয়স্কাদিগের ব্যঙ্গের জ্বালায় সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্য মনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে২ বলিলেন,

"হাঁ দেখ্, কামিনি, তুই আরও কি কচি খুকী যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস্?"

কামিনী আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, "আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।"

আমার কণ্ঠ স্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এ কি এ?"

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "চতুর চূড়ামণি! আমার নাম ইন্দিরা—আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?"

তিনি অবাক্ হইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, "এ আবার কোন্ রঙ্গ কুমুদিনি? তুমি এখানে কোথা হইতে?"

আমি বলিলাম, "কুমুদিনী আমার আর একটি নাম। তুমি বড় গোবর গণেশ, তাই এত দিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রাম রাম দত্তের বাড়ী ভোজন করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক—আমি কুলটা নহি।"

তিনি একটু আত্মবিস্মৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এতদিন এত ছলনা করিয়াছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে যে তোমার স্ত্রীকে পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই দিনেই পরিচয় দিতাম।" দান পত্রখানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম "সেই রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে 'হয় তুমি আমায় গ্রহণ করিবে, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।' সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এই খানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অভিরুচি হয়, আমায় গ্রহণ কর; না অভিরুচি হয়, আমি তোমার উঠান ঝাঁটি দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব, দান পত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।"

এই বলিয়া সেই দান পত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড২ করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া—আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে আমি প্রাণে মরিব। তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে চল।"

সমাপ্ত।

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

যুগলাঙ্গুরীয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য চারি আনা

পৌষ, ১৩৪৭

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

তাম্রলিপ্তের ঘটনা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুকে আসিয়াছিলেন।......তমলুকের দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা ভোলেন নাই। পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে আঁকিয়াছিলেন।—'বঙ্কিম-জীবনী', ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩০৪-৬।

'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' একই সময়ে রচিত হয়; বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তখন ছোট গল্প লেখার একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল। 'ইন্দিরা' ১২৭৯ সনের চৈত্র এবং 'যুগলাঙ্গুরীয়' ১২৮০ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হয়। ১২৮১ বঙ্গাব্দে ইহা পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৬। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ :—

` যুগলাঙ্গুরীয়। / উপন্যাস। / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় /. প্রণীত। / কাঁটালপাড়া। / বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক /'মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১২৮১। /

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ইহার পাঁচটি সংস্করণ হয়। অনুমান হয়, ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে 'উপকথা' পুস্তকের প্রথম (১৮৭৭) ও দ্বিতীয় (১৮৮১) সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৬। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' পুস্তকে (১৮৮৬) এই সংস্করণই যুক্ত হইয়াছিল। পঞ্চম বা বঙ্কিমের জীবিতকালে শেষ সংস্করণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫০। বর্ত্তমান সংস্করণে এই পাঠই অনুসৃত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ., ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে *The Two Rings* নামে এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পি. এন. বসু ও মোরেনো *Yugalanguriya* নামে 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সনে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত জে. ডি. অ্যাণ্ডারসনের *Indira and other Stories* পুস্তকেও ইহার অনুবাদ আছে। ১৯১৯ সনে কলিকাতা হইতে ডি. সি. রায়-কৃত অনুবাদ *The Two Rings and Radharani* নামে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে পাটনা হইতে কে. আর. ভাট ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

যুগলাঙ্গুরীয়

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চম সংস্করণ হইতে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের * চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে, সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা। বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর, এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন যে এই যুবার সঙ্গে একা কথা কহেন, তাহা সকলেই জানিত। হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর। ইহার পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের প্রতিবাসী, এজন্য উভয়ে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে, সর্ব্বদা একত্র সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল। একটু মাত্র বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা, এই যুবক যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর অনেক বিনয় করিয়া, বিশেষ কথা আছে বলিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিল, "আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি, এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থানে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না। আর ডাকিলে আমি আসিব না।"

ষোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, "আমি আর বালিকা নহি" ইহা বড় মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অনুভব করিবার লোক সেখানে কেহই ছিল না। পুরন্দরের বয়স বা মনের ভাব সেরূপ নহে।

---

* আধুনিক তামলুক। পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এই নগর সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল।

পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া, আহ্লাদিত হউন বা না হউন, বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্য্যন্ত দেন না কেন? এক দিন অকস্মাৎ এ বিষয়ের কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্যহেতু চীনদেশে নির্ম্মিত একটি বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলিন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেষ্ঠিপত্নী পুরাতন অলঙ্কারগুলিন কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলিন রাখা ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে অর্দ্ধাংশ আছে, তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর মহাভীতিসঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ।

জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলি
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সর মুখ পরস্পরে।
হইতে পারে

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এত দিন ফিরিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই আর একে তিন বৎসর গেলে, অকস্মাৎ এক দিন ধনদাস বলিলেন যে, "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সেইখানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেই-খানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস, পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। উপযুক্তকালে কাশীতে উপনীত হইলে পর, ধনদাসের গুরু আনন্দস্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল, কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না। ধনদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে যাহারা সচরাচর থাকে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্য্যন্ত ধনদাস ভিন্ন গৃহস্থ কেহও জানে না যে, কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে, যেখানে আনন্দস্বামী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। তিনি যে কেন পাত্রের পরিচয় ব্যক্ত করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন—তাঁহার মনের কথা বুঝিবে কে? একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যাসজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতেছেন—"এ কি রহস্য! কিন্তু পুরন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয় তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।"

এমন সময়ে ধনদাস কন্যাকে ডাকিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষুঃ দৃঢ়তর বাঁধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতা?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞা। তুমিও আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর। মন্ত্রগুলি মনে মনে বলিও।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইয়া যদি কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, পাত্রও তাঁহার ন্যায় আবৃতনয়ন। এইরূপে বিবাহ হইল। সে স্থানে গুরু পুরোহিত এবং কন্যাকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বর কন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না। শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দস্বামী বরকন্যাকে কহিলেন যে, "তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য; ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আমি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটি অঙ্গুরীয় আছে। দুইটি ঠিক এক প্রকার। অঙ্গুরীয় যে প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা প্রায় পাওয়া যায় না। এবং অঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ূর অঙ্কিত আছে। ইহার একটি বরকে একটি কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুরীয় অন্য কেহ পাইবে না—বিশেষ এই ময়ূরের চিত্র অননুকরণীয়। ইহা আমার স্বহস্তখোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী। যদি বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, তিনিই তাঁহার পত্নী। তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীয় হারাইও না, বা কাহাকে দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে পঞ্চ বৎসর মধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীয় পরিও না। অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী, রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে।"

এই বলিয়া আনন্দস্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিলেন। হিরণ্ময়ী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, গৃহমধ্যে কেবল পিতা ও পুরোহিত আছেন —তাঁহার স্বামী নাই। তাঁহার বিবাহরাত্রি একাই যাপন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না—হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি, না ফিরিলেই কি?

পুরন্দর যে এই সাত বৎসরে ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, "তিনি যে আজিও আমায় ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া আসিলেন না, এমত কদাচ সম্ভবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয়। তাঁহার দেখার আমি কামনা

করি না, এখন আমি অন্যের স্ত্রী; কিন্তু আমার বাল্যকালের সুহৃৎ বাঁচিয়া থাকুন, এ কামনা কেন না করিব?"

ধনদাসেরও কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীর আর কেহ ছিল না, এজন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, তুমি মরিও না। কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, "বাছা, তোমার কিসের ভাবনা? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।"

কিন্তু সে আশা বিফল হইল—ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরণ্ময়ী জানিলেন যে, ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকেও না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ। শেষে শোধনও অসাধ্য হইল। ধনদাস মর্মের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীরা আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে, তোমার পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের ঋণ পরিশোধ কর। শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের কথা যথার্থ। তখন হিরণ্ময়ী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন। বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন।

এখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীরমধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র এক সহায় পরম হিতৈষী আনন্দস্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন। হিরণ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল না যে, আনন্দস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী যুবতী এবং সুন্দরী—একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভাল নহে। আপদও আছে—কলঙ্কও আছে। অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা—তাহার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাত্রিতে আসিয়া তাঁহার গৃহে শয়ন করিতেন।

এক দিন হিরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর, অমলা তাহাকে কহিল, "সংবাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চক্ষুর জল অমলা না দেখিতে পায়। পৃথিবীর সঙ্গে হিরণ্ময়ীর শেষ সম্বন্ধ ঘুচিল। পুরন্দর তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। নচেৎ ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা ভুলুক, তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি যাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন—"ভুলেন নাই—কতকাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন? বিশেষ তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন?" আবার ভাবিলেন, "আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?"

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শেঠির ছেলে।"

হি। চিনি।

অ। তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তামলিপে কেহ কখন দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, পূর্ব্ব-সম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হইতে পারিত, ইহা ভাবিয়া যাহার খর রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়ন-কালে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?"

অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।"

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিয়া মধুর ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "হাঁ গা বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম্ম ?"

হিরণ্ময়ী কহিল, "কি করিয়াছি ?"

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই ?

হি। কি বলি নাই ?

অম। পুরন্দর শেঠির সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা।

হিরণ্ময়ী ঈষল্লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন—তার বলিব কি ?"

অম। শুধু প্রতিবাসী ? দেখ দেখি কি এনেছি !

এই বলিয়া অমলা একটি কৌটা বাহির করিল। কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্ব্বদর্শন, মহাপ্রভাযুক্ত, মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যা হীরা চিনিত—বিস্মিতা হইয়া কহিল, "এ যে মহামূল্য—এ কোথায় পাইলে ?"

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিল, এই হার গ্রহণ করিলে, চিরকাল জন্য দারিদ্র্য মোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহিতে পারিতেছিল না। অতএব হিরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "অমলা, তুমি বণিককে কহিও যে, আমি ইহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা বিস্মিতা হইল। বলিল, "সে কি ? তুমি কি পাগল, না আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না ?"

হি। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই। আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া রাজা মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহার দিল। বলিল, "এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই

যোগ্য।” রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছু দিন পরে পুরন্দরের এক জন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, “আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটীরে বাস করেন ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। আপনি তাঁহার বাল্যকালের সখী; আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই। তিনি এমন বলেন না যে, আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন। আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন। আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।”

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্যজন্য যত দুঃখভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতা মাতার সহবাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত। সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, “এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক।”

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। অমলা উপস্থিতা ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, “অমলা, তথায় আমার একা বাস করা যাইতে পারে না। তুমিও তথায় বাস করিবে চল।”

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী এক দিন নিষেধ করিলেন। অমলা আর যাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিতা হইলেন। এক দিন অমলা কহিল, “তুমি সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইও না, বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ী আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এখন অর্থের অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব—তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।” হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে মনে নানা প্রকার সন্দিহান হইলেন।

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয় সং৺৺।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর পঞ্চমাষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া আমার কি লাভ? হয়ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথবা চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি মনে আঁকিয়া রাখি? এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নহিলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি।"

এমন সময়ে অমলা বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে!"

হি। কি হইয়াছে?

অ। রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস-দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?

এমন সময়ে রাজদূতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, "রাজাধিরাজ পরম ভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, হিরণ্ময়ী এই মুহূর্ত্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। রাজা পরম-ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলে, আমি রাজদর্শনে যাইতে সম্মতা। তুমি সঙ্গে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল।

তৎসমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী রাজাবরোধমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা আসিয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রতিহারী একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাজা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, কবাটবক্ষ; দীর্ঘহস্ত; অতি সুগঠিত আকৃতি; ললাট প্রশস্ত; বিস্ফারিত, আয়ত চক্ষু; শান্ত মূর্ত্তি—এরূপ সুন্দর পুরুষ কদাচিৎ স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজাও শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে, রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী দুর্লভ।

রাজা কহিলেন, "তুমি হিরণ্ময়ী?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকাইয়াছি, তাহা শুন। তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে?"

হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দস্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে?

হি। মহারাজ! সে অঙ্গুরীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহ্য বৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন?

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে? আমাকে দেখাও।"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চ বৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে—অতএব তাহা পরিতে আনন্দস্বামীর যে নিষেধ ছিল—তাহা এখনও আছে।"

রাজা। ভালই—কিন্তু সেই অঙ্গুরীয়ের অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দস্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে?

হি। উভয় অঙ্গুরীয় একই রূপ; সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।

তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা তাহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই অঙ্গুরীয় কাহার?"

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেব! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?" পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেব! ইহাতে জানিলাম যে, আমি বিধবা হইয়াছি। স্বজনহীন

মৃতের ধন আপনার হস্তগত হইয়াছে। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।"

হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধনলোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।

রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।

হি। তবে আপনি বলে ছলে কৌশলে তাঁহার নিকট ইহা অপহরণ করিয়াছেন।

রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তোমার বড় সাহস। রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।"

হি। নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?

রা। আনন্দস্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—আমি চপলা, না জানিয়া কটু কথা বলিয়াছি।"

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু কিছুমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন না। বরং বিষণ্ণা হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমি এত দিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীত্বের যন্ত্রণাভোগ করি নাই। এক্ষণ হইতে আমার সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব?" হিরণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমি আমার মহিষী বটে, কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন?"

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাসী অমলা সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন?"

হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন; ভাবিতেছিলেন, "রাজা মদনদেব কি সর্ব্বজ্ঞ?"

তখন রাজা কহিলেন, "আর একটা গুরুতর কথা আছে। তুমি পরনারী হইয়া পুরন্দরপ্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?"

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, জানিলাম আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। হীরকহার আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

রাজা। তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার।

এই বলিয়া রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন। হিরণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে পারিয়া বিস্মিতা হইলেন। কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি?"

রা। না, তোমার দাসী বা দূতী অমলা আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ডাকাইব?

হিরণ্ময়ীর অমর্ষান্বিত বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র। অপরাধ ক্ষমা করুন। অমলাকে ডাকাইতে হইবে না—আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি।"

এবার রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয়। তুমি পরের পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন এ হার গ্রহণ করিলে?"

হি। প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? কি প্রকারে প্রণয়োপহার?"

হি। আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্যা নহি। আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে রাজার বিস্ময়-বিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমিই জিতিলে,—আমি হারিলাম। তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না।"

হি। মহারাজ! তবে এ কাণ্ডটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আমি অতি সামান্যা স্ত্রী—আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।

রাজা হাস্যত্যাগ না করিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় রাজারই এরূপ রহস্য সম্ভবে। ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্দ্ধ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে? তাহা কি আছে?"

হি। মহারাজ! আপনি সর্ব্বজ্ঞই বটে। পত্রার্দ্ধ আমার গৃহে আছে।

রা। তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্দ্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথা হইতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পত্রার্দ্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্দ্ধ দেখিয়া, আর একখানি পত্রার্দ্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বলিলেন, "উভয় অর্দ্ধকে মিলিত কর।" হিরণ্ময়ী উভয়ার্দ্ধ মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন, "উভয়ার্দ্ধ একত্রিত করিয়া পাঠ কর।" তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত মত পাঠ করিলেন।

"(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।) তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।"

পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, "এই লিপি আনন্দস্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।"

হি। তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন বা, আমাদিগের বিবাহকালে নয়নাবৃত হইয়াছিল—কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চ বৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আর ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা। আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল।

এ দিকে আনন্দস্বামী পাত্রানুসন্ধান করিয়া একটি পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটির অশীতি বৎসর পরমায়ু। তবে অষ্টাবিংশতি

বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে, মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে, ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসরমধ্যে পত্নীশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোন রূপে পঞ্চ বৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবার সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এত দিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা হও, বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইবার কারণে এই পত্রার্দ্ধ তোমার অলঙ্কারমধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চ বৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছ। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয় মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল বড় গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক মাস হইল আনন্দস্বামী এ নগরে আসিয়া, তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। পরে কহিলেন, 'আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, হিরণ্ময়ী এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। এ বিষয়ে আমাকেই আপনার ঋণী জানিবেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিব। সম্প্রতি আমার আর একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। হিরণ্ময়ীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন।' এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকটে দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমি তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমিই পাঠাইয়াছিলাম—সেও তোমার পরীক্ষার্থ।"

হি। তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট স্বামীরূপে পরিচয় দিয়া, আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?

রাজা। যে দণ্ডে আমি আনন্দস্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট হার পাঠাই।

তার পর অদ্য পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া, তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, 'তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদায় জানি। তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময়ে আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।' তিনি কহিলেন যে, 'মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু বনিতার সহিত মিলনের আমার স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়।' আমি কহিলাম, 'আমার আজ্ঞা।' তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে, 'আমার সেই বনিতা সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা, তাহা আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শিবে।' আমি উত্তর করিলাম, 'অঙ্গুরীয়টি দিয়া যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।' তিনি কহিলেন, 'এ অঙ্গুরীয় অন্যকে বিশ্বাস করিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।' আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।

হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে রাজপুরে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন ; শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক জন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ী, ইনিই তোমার স্বামী।"

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রৎ স্বপ্নের ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন। দেখিলেন, পুরন্দর!

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, "সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী। আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিবারাত্র ইঁহাকে প্রহরাতে রাখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ জানি যে, ইনি অনন্যানুরাগিণী। তোমার ইচ্ছাক্রমে উঁহার পরীক্ষা করিয়াছি, আমি উঁহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে, হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎপ্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি। যদি হিরণ্ময়ী তাহাতে দুঃখিতা হইত, 'আমি নির্দ্দোষী, আমাকে গ্রহণ করুন'

বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, হিরণ্ময়ী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা না করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি কুলটা, আমাকে ত্যাগ করুন।' হিরণ্ময়ি! তোমার তখনকার মনের ভাব আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।"

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিণয় হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজা। আনন্দস্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া সিংহলে লোক পাঠাইয়া ইঁহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেইখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তে আসেন নাই। এই জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।"

পাঠভেদ

১২৮০ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'যুগলাঙ্গুরী'য় প্রকাশিত হয়। ১২৮১ সনে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি) ইহা পুস্তকাকারে "কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৬। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ইহার পাঁচটি সংস্করণ হইয়াছিল ; ৪র্থ সংস্করণ—১৮৮৬ (পৃ. ৩৬) এবং ৫ম বা শেষ সংস্করণ ১৮৯৩ (পৃ. ৫০)। ১ম ও ৫ম সংস্করণে পরিবর্ত্তন যৎসামান্য ; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

পৃ. ৩, পংক্তি ২, "নগর" স্থলে "নগরী" ছিল।
১০, "একা" স্থলে "একাকিনী" ছিল।
১৫, "যথাবিহিত কালে" স্থলে "যথাকালে" ছিল।
২০, "একা" স্থলে "একাকিনী" ছিল।
পাদটীকায়, "নগর" স্থলে "নগরী" ছিল।

পৃ. ৫, পংক্তি ২০, "অষ্টাদশ বৎসরের" স্থলে "অষ্টাদশ-বর্ষীয়া" ছিল।

পৃ. ৬, পংক্তি ৩, "কর্ণ" স্থলে "কাণ" ছিল।

পৃ. ৭, পংক্তি ৫, "উপযুক্তকালে" স্থলে "যথাকালে" ছিল।
৯, "ব্যক্তি ভিন্ন" স্থলে "ব্যক্তিরা ভিন্ন" ছিল।
১৭, "একাকী" স্থলে "একা" ছিল।
২২, "দুই চক্ষুঃ" স্থলে "যুগল চক্ষুঃ" ছিল।
২৩, "এ কি পিতা" স্থলে "এ কি পিতঃ" ছিল।
২৫, "কন্যার" স্থলে "কন্যাকে" ছিল।

পৃ. ৮, পংক্তি ১৫, "অমঙ্গল হইবে" স্থলে "অমঙ্গল ঘটিবে" ছিল।
১৭, "গৃহমধ্যে কেবল" কথা দুইটির পর "তাঁহার" কথাটি ছিল।
১৮, "তাঁহার বিবাহরাত্রি" স্থলে "বিবাহরাত্রি" ছিল।

পৃ. ৯, পংক্তি ২২, "এখন" স্থলে "তখন" ছিল।

পৃ. ১০, পংক্তি ১১, "তাঁহার লাভ" স্থলে "তাহাতে তাঁহার লাভ" ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ১৮, সম্বোধনে "অমলা" স্থলে "অমলে" ছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ২৫, "রাজাকে প্রণাম করিয়া" হইতে পর-পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তির "যোগ্য।" পর্য্যন্ত অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ১২, পংক্তি ১৬, "প্রণাম করিয়া" স্থলে "প্রণাম হইয়া" ছিল।

১৭, সম্বোধনে "অমলা" স্থলে "অমলে" ছিল।

"বাস করা যাইতে" স্থলে "বাস করা হইতে" ছিল।

পৃ. ১৬, পংক্তি ১৯, "প্রণাম করিতেছি" স্থলে "প্রণাম হইতেছি" ছিল।

পৃ. ১৮, পংক্তি ১২, "আনন্দস্বামী" স্থলে "স্বামী" ছিল।

পৃ. ১৯, পংক্তি ৬, "সচ্চরিত্রা" স্থলে "সুচরিত্রা" ছিল।

৮, "অঙ্গুরীয়টি" কথাটির পূর্ব্বে "সেই" কথাটি ছিল।

পৃ. ২০, পংক্তি ১১, "তাম্রলিপ্তে" স্থলে "তাম্রলিপ্তিতে" ছিল।

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

চন্দ্রশেখর

[১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

চন্দ্রশেখর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

"চন্দ্রশেখর" প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।

অনুজ

শ্রীমান্ বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

এই

গ্রন্থ

স্নেহ-চিহ্নস্বরূপ

উপহার

প্রদত্ত হইল।

সম্পাদকীয় ভূমিকা

১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-সংখ্যা হইতে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-সংখ্যা পর্য্যন্ত মোট ১৪ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' 'চন্দ্রশেখর' ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়; 'বঙ্গদর্শনে' উপন্যাসখানি "পরিশিষ্ট"-সমেত ৪৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল; খণ্ড-বিভাগ ছিল না। ১২৮২ বঙ্গাব্দে [১ জুন ১৮৭৫] পুস্তকাকারে 'চন্দ্রশেখর' প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে প্রচুর পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ইহা উপক্রমণিকা বাদে ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়; ১ম খণ্ড—৫ পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ড—৯ পরিচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড—৮ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড—৪ পরিচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড—৪ পরিচ্ছেদ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড "পরিশিষ্ট"-সহ—৯ পরিচ্ছেদ; মোট এই ৩৯ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি পরিচ্ছেদের বিলোপসাধন করেন। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৯৫। আখ্যা-পত্র এইরূপ ছিল :—

চন্দ্রশেখর। / উপন্যাস। / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। / কাঁটালপাড়া। / বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১২৮২। /

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'চন্দ্রশেখরে'র আরও দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৭) ও ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ২৩১) হয়। চতুর্থ সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণেও বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখরে'র অনেক পরিবর্ত্তন করেন। শেষ অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণ উপক্রমণিকা বাদে ছয় খণ্ডে—৫+৮+৮+৪+৪+৮, মোট ৩৭ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ ১ম সংস্করণ হইতেও বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি পরিচ্ছেদের বিলোপ-সাধন করেন। বর্ত্তমান সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপন্যাসে ঐতিহাসিক এবং অলৌকিক বিষয় সন্নিবেশের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল; 'বিষবৃক্ষ' এবং 'ইন্দিরা' লিখিয়া তাঁহার রোমান্সপ্রবণ মন যেন একটু হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া বাঙালীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের বাসনা বরাবরই তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ স্ফূর্ত্তি তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি

ফিরাইয়াছিলেন। ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানসপুত্র; ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখানে রোমান্স-রচনার যে অবকাশ তিনি পাইলেন, নিতান্ত সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি ততখানি অগ্রসর হইতে পারিতেন না। আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশ্বাস ছিল, 'চন্দ্রশেখরে' আমরা সর্ব্বপ্রথম তাহার পরিচয় পাই। তাঁহার সৃষ্ট উপন্যাস-জগতে সর্ব্বপ্রথম আদর্শ-চরিত্র হিসাবে তিনি প্রতাপের অবতারণা করিয়াছেন। বহুবিধ সংস্কার এবং বাসনার সংঘর্ষে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শিল্প-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, বহু সমালোচক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ (গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী) 'চন্দ্রশেখর'কে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্ত্তি বলিয়াছেন।

'চন্দ্রশেখরে' ইতিহাস যৎসামান্য, সুতরাং সেদিক্ দিয়া ইহার বিচারের বিশেষ সার্থকতা নাই।

'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হইলে 'ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' প্রভৃতি দুই একটি সাময়িক-পত্রে ইহার বিরুদ্ধ-সমালোচনা হয়। এই উপন্যাসে বঙ্গদেশের জমিদারবর্গের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকের বিরাগভাজন হন। প্রশংসা করিবার লোকেরও অভাব ছিল না। পূর্ণচন্দ্র বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সমালোচকেরা এই উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া ইহার গুণকীর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী কালে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'চন্দ্রশেখরে'র কোনও অনুবাদ হয় নাই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্তোষের মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পর-বৎসর অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আর একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তামিল ভাষায় এস. টি. পিলে (মাদ্রাজ, ১৯০৮) ও এস. কে. শর্ম্মা (মাদ্রাজ) ইহার দুইটি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তেলেগু ভাষায় টি. এস. রাওয়ের (টাসুকু, ১৯১০) অনুবাদ আছে।

উপক্রমণিকা

প্রথ ম পরিচ্ছেদ

বালক বালিকা

ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে, শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎ সুকুমার বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল; আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টা পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্ব্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময়ে সুপক্ব আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গণ। কয়খান নৌকা যাইতেছে বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর একবার

গণিয়া একুশখানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয় জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয় জন বাঁচিয়া থাকে? কয় জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর!

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর। উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্ত পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতি মাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, "আয় শৈবলিনি! সাঁতার দিই।" দুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই জনেই পটু, তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুই জনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল। ফেনচক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয়, রজতাঙ্গুরীয়মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুই জনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনি, এই আমাদের বিয়ে!"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এইখানেই।"

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর মিলিল

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্‌সি বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী এক জন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী—চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল না। চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সে দিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইল। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন। —দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই; দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেন না, সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সংসার-বন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া, সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?

এই বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

প্রথম খণ্ড

পাপীয়সী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দলনী বেগম

সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গমহলে, এক স্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই। প্রকোষ্ঠমধ্যে, সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যতলে, সুকোমল গালিচা পাতা। রজত-দীপে গন্ধ তৈলে জ্বালিত আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিঙ্খাবের বালিশে একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিন্যস্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকাকৃতী যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতা, বালিকার ন্যায় সুকুমার। গুলেস্তাঁ পড়িতেছে, এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, এবং আপন মনে কতই কি বলিতেছে। কখন বলিতেছে, "এখনও এলেন না কেন?" আবার বলিতেছে, "কেন আসিবেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি এক জন দাসীমাত্র, আমার জন্য এত দূর আসিবেন কেন?" বালিকা আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। আবার অল্প দূর পড়িয়াই বলিল, "ভাল লাগে না। ভাল, নাই আসুন, আমাকে স্মরণ করিলেই ত আমি যাই। তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে এক জন বৈ ত নই।" আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে আরম্ভ করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল, "ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? এক জন কেন আর এক জনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?" তখন যুবতী পুস্তক ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিল। নির্দ্দোষ-গঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশি-তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণরচিত

সুগন্ধ-বিকীর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গসঞ্চালন মাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্য মাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

তখন, সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল, এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, গীত আরম্ভ করিল—যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া গায়িতেছে। এমত সময়ে, নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বালিকা চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীর কাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্ব্বক, এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গায়িতেছিলে ?" যুবতীর নাম, বোধ হয়, দৌলতউন্নেসা। নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ "দলনী" বলিতেন। এজন্য পৌরজন সকলেই "দলনী বেগম" বা "দলনী বিবি" বলিত।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল। দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, "তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও—আমি শুনিব।"

তখন মহাগোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন, নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ নাই। তার পর,—তার পর, দলনীর মুখ ফুটিল না! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না—কিছুতেই ফুটিল না! মুখ, ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরুস্বভাব কবির, কবিতা-কুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয়সম্বোধনের ন্যায়, ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ? রাগ না কি ?"

দ। কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাজানা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সমুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন ?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাহাদিগের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি সে সকল কথা শুন নাই?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব হইল। মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?"

দলনী বলিল, "আপনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন?—আমি বালিকা, দাসী, এ সকল কথা আমার বলা নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলিবার একটি অধিকার আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।"

নবাব বলিলেন, "সে কথা সত্য দলনী,—আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে যেমন ভালবাসি, আমি কখন স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই, বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।"

দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল। দলনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চক্ষে জল পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

মীরকাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুতরস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এই জন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।"

দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল, "প্রাণেশ্বর! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীরকা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে? না বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, "আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।"

"কি?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন?"

"কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে না কি? বল, গুরগণ খাঁকে বরতরফ করিয়া তোমায় বাহাল করি।"

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না। মীরকাসেম তখন সস্নেহ-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইতে চাও?"

"আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।" মীরকাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময়ে কোথায় থাকিব?"

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "তবে কলমদান দাও।"

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্ম্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন?"

মীরকাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-পরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?"

মীরমুন্সী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভীমা পুষ্করিণী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারি ধারে, ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে ; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্য্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনী-গণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসী-হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরে গ্রথিত জলজপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণ-কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদুবায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জলস্পৃষ্ট করে, বক্ত্রমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে ; সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে ; জল পতনকালে বিম্বে বিম্বে শত সূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল ; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?

পুষ্করিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল বাড়ী যাই।"

শৈবলিনী। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।

সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ।

শৈ। ঘরে যাব না লো সই!
আমার মদনমোহন আসচে ওই।
হায়! যাব না লো সই!

সু। মরণ আর কি? মদনমোহন ত ঘরে বোসে, সেইখানে চল্ না।

শৈ। তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী, ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

সু। নে এখন রঙ্গ রাখ্। রাত হলো—আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমির মা বলছিল এদিকে একটা গোরা এয়েছে।

শৈ। তাতে তোমার আমার ভয় কি?

সু। আ মলো, তুই বলিস্ কি? ওঠ, নইলে আমি চলিলাম।

শৈ। আমি উঠবো না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্ব্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যেবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। অঙ্গুলি-নির্দ্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে, এক তালবৃক্ষতলে, সর্ব্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিত্তল কলস, গড়াইতে গড়াইতে ঢক ঢক শব্দে উদরস্থ জল উদগীর্ণ করিতে করিতে, পুনর্ব্বার বাপীজল-মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষঃ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরী সমেত মস্তকের অর্দ্ধভাগ মাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে, অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া, ঘাটের নিকটে আসিল।

ইংরেজ, দেখিতে অল্পবয়স্ক বটে। গুম্ফ বা শ্মশ্রু কিছুই ছিল না। কেশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁক জমক; এবং চেন্ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পারিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া, জলের নিকটে আসিয়া, বলিল, "I come again fair lady."

শৈবলিনী বলিল, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

"Oh—ay—that nasty gibberish—I must speak it I suppose. হম again আয়া হ্যায়।"

শৈব। কেন? যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়?"

শৈ। বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম! John you mean? হম্ জন নহি, হম্ লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম, লরেন্স অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স ফষ্টর, পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আম্রবৃক্ষতল হইতে অশ্বমোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক টিবিয়ট নদীর তীরস্থ পর্ব্বতপ্রতিধ্বনি সহিত শ্রুত গীতি স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, "সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে মেরি ফষ্টরের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত। দেশভেদে কি রুচিভেদ জন্মে? তুষারময়ী মেরি কি শিখারূপিণী উষ্ণ দেশের সুন্দরীর তুলনীয়া? বলিতে পারি না।"

ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জলকলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া, নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয় জানু বন্ধন করিয়া মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে, তুলটে হাতে-লেখা পুতি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর এক শত দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত, তদুপরি চন্দন-রেখা।

শৈবলিনী গৃহপ্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, 'যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্র হইল, তখন কি বলিব?' কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের সূত্রবিশেষের অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "আজি এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন?"

শৈবলিনী বলিল, "আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে!"

চন্দ্র। কেন বকিব?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।

চন্দ্র। বটেও ত—এখন এলে না কি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা, সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না" এই বলিয়া আবার শাঙ্কর ভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর, প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট। শৈবলিনী প্রথামত, স্বামীর অন্ন ব্যঞ্জন, তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালোচনা করিতেন, অল্প রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গম্ভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুতি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুক্ত বাতায়নপথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে! তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগতলে, মুদিত পদ্মকোরকসদৃশ, লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে, সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন এক-বার, জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল। সেই বিলাস-চাঞ্চল্য-শূন্য, সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন

করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মীর মুন্সীর নিকট হইতে সম্বাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্‌টর বা কুঠিয়াল। লরেন্স অল্প বয়সে মেরি ফষ্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ফষ্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল। একদা তিনি প্রয়োজনবশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল পদ্মস্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়ন-পথে পড়িল। শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু ফষ্টর ভাবিতে ভাবিতে কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন। ফষ্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কটা চক্ষুর অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল, এবং কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল। অকস্মাৎ তাঁহার

স্মরণ হইল যে, সংসার-সমুদ্রে স্ত্রীলোক তরণী স্বরূপ—সকলেরই সে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া, বাঙ্গালি সুন্দরীকে এ সংসারে সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না। অনেক বাঙ্গালির মেয়ে, ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কি ভজিবে না ? ফষ্টর কুঠির কারকুন্‌কে সঙ্গে করিয়া আবার বেদগ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। কারকুন্ শৈবলিনীকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল।

বাঙ্গালির ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায়, কিন্তু একটি একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাহে। শৈবলিনীর সেই দশা ঘটিল। শৈবলিনী, প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে, ফষ্টরকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, "ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।" শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল। তাহাও পাঠক জানেন।

অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশুভক্ষণে চন্দ্রশেখর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী যাহা, তাহা ক্রমে বলিব ; কিন্তু সে যাই হউক, ফষ্টরের যত্ন বিফল হইল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।" যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফষ্টরকে সদ্যই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

শৈবলিনীর রূপ ফষ্টরের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনীর আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভসম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে, অতএব অকর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যসম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—জীর

ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্মশব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "Now or never !"

এই ভাবিয়া, যে দিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সে দিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রামবাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, বাড়ী লুঠিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েক জন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব! দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, দ্রব্য সামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। কেহ কেহ বলিল, "সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাহাকে আর ঘরে লইবে না। যে পাল্‌কী দেখিলে, ঐ পাল্‌কীর মধ্যে সে গিয়াছে।"

যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া, নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী। আবার তাহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া এ স্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল। গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাপিতানী

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা সমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন আবার হিন্দু দাস দাসী কেন ?

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্য স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি যানান্তরে কলিকাতায় গেলেন। এমত শঙ্কা ছিল না যে, তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর নৌকার সঙ্গে না থাকিলে, কেহ নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরেজের.নৌকা শুনিলে কেহ নিকটে আসিবে না। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর.তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবায়ু বড় মধুর ;—চোরের মত পা টিপি টিপি আসিয়া, এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকা-দাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে—কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে ; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া, আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে, স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কাণের কাছে মধুর সংগীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে বায়ু বড় ধীরপ্রকৃতি,—বড় গম্ভীর-স্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ ! সংসারে যদি সকলই এমন হয় ত কি না হয় ! দে নৌকা খুলিয়া দে ! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে ; গাত্রমার্জ্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে ;

কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্দ্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে,—"দেহি পদপল্লবমুদারং"। নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্তক-রাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কাণে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কাণের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গ সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবনদেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক এইরূপ ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা, প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না। রক্ষকেরা ভদ্রহাটির ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে, এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপরা—সাড়ীর রাঙ্গা দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আলতার চুপড়ী। নাপিতানী নৌকার উপর অনেক কাল কাল দাড়ী দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক্ হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানি আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা যায় না। ফষ্টর জানিতেন যে, শৈবলিনী যদি না পলায়, অথবা প্রাণত্যাগ না করে, তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যবনের কৃত পাক, উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখন তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফষ্টর ভৃত্যদিগের পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে এক জন দাসী দাঁড়াইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল, বলিল, "হাঁ গা—তোমরা কোথা থেকে আসচ গা?"

চাকরাণী রাগ করিল—বিশেষ সে ইংরেজের বেতন খায়—বলিল, "তোর তা কি রে মাগী! আমরা হিল্লী, দিল্লী, মক্কা থেকে আসচি।"

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বলি তা নয়, বলি আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকায় যদি মেয়ে ছেলে কেহ কামায় তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

চাকরাণী একটু নরম হইল। বলিল, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া

সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে, তিনি আলতা পরিবেন কি না। যে কারণেই হউক, শৈবলিনী অন্যমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আলতা পরিব।" তখন রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া, দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং পূর্ব্বমত পাকশালার নিকট নিযুক্ত রহিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। এবং তাহার একটি চরণ লইয়া আলতা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নাপিতানী, তোমার বাড়ী কোথা?"

নাপিতানী কথা কহিল না। শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাপিতানী, তোমার নাম কি?"

তথাপি উত্তর পাইলেন না।

"নাপিতানী, তুমি কাঁদচ?"

নাপিতানী মৃদু স্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ কাঁদচ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিল, "আমি আসতে মাত্র চিনেছি। আমার কাছে ঘোম্‌টা। মরণ আর কি? তা এখানে এলি কোথা হতে?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও! আমার এই সাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আল্‌তার চুপড়ী নাও। ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন করে?"

সু। কোথা হইতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয়, দিন পাই ত এর পর দিব। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। লোকে বলিল বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি।

শৈ। একলা এলি কেমন করে?

সুন্দরীর মুখে আসিল, "তুই কালামুখী সাহেবের পাল্কী চড়ে এলি কেমন করে?"

কিন্তু অবসর বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল, "একলা আসি নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গী একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি।"

শৈ। তার পর ?

সু। তার পর তুমি আমার এই সাড়ী পর, এই আল্‌তার চুপড়ী নাও, ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গীতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গী খুলিয়া দিয়া তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তোমার দশা ?"

সু। আমার জন্যে ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই যে, সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী ; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ্ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রি মধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই। আজ হবে কি না, তাও বলিতে পারি না।

শৈ। ভাল, আমি যেন গেলেম। গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি ?

সু। ইল—লো ! কেন নেবেন না ? না নেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি ?

শৈ। দেখ—ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে ?

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্ব্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বলবি ?"

শৈ। বলিব।

সু। এই গঙ্গার উপর ?

শৈ। বলিব। তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, অধর্ম্ম করিবেন না, তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে ?"

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, ঐ উহাকে ইংরেজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে। আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু,—

সু। কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন ওঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাঙ্‌তা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্য-ফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক্, সে কথা দূর হৌক্—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণ সেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব।—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন। দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মেলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব।—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও। তুমি যাও।

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, বলিল, "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়। মুঙ্গেরে যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়! ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া, সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া, আল্‌তার চুপড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইত। বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সম্বাদ বুদ্ধিমান্ লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।—কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আপনাপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এত দিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহ-বন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে ভৃত্য লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে

ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল। যদি বাড়ী গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন দেখিতে পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়—আরাম হইবে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অসুখ হইতেছে কেন? কাহার না পীড়া হয়? তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে? চন্দ্রশেখর দ্রুত চলিলেন। যদি পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলিনীকে আরাম করিবেন, স্বস্ত্যয়ন করিব। যদি পীড়া ভাল না হয়! চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, ভগবান্, আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়া আবার কি বঞ্চিত করিবেন! তাহারই বা বিচিত্র কি—আমি কি তাঁহার এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখ বিধান করিবেন না? হয়ত ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি গিয়া দেখি, শৈবলিনী নাই?—যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। চন্দ্রশেখর অতি দ্রুত-পদে চলিলেন। পল্লীমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখপ্রতি অতি-গম্ভীর ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি হাসিল। কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—ভীত হইলেন—অন্যমনা হইলেন—কোন দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্ব্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্র-শেখরকে দেখিয়া, ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল! চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই, —চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরেরই দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া, সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর, প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

কেহ উত্তর দিল না; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বুসঞ্চারী মৃদু-পবন-হিল্লোলে, ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গায়িতেছিল।

* * * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন, চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ্, একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

পাপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুল্‌সম্‌

"না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল্‌।"

দলনী বেগম, এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরকজড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল; একটা মুখর কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল। কাকাতুয়া "বাঁদী" বলিয়া গালি দিল। এ গালি দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।

নিকটে এক জন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্‌।"

কুল্‌সম্‌ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার বোঝাই দুইখানা কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে এক জন ইংরেজ চরন্দার; সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন যে, নৌকা ছাড়িয়া দাও। উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে। গুর্‌গণ খাঁ বলেন, লড়াই বাধে বাধুক। নৌকা ছাড়িব না।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু।। আজিমাবাদের* কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে ত আগে সেইখানে বাধিবে। সেখান হইতে ইংরেজেরা হঠাৎ বেদখল না হয় বলিয়া সেথা হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র।

দ। তা গুর্‌গণ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন যে, আমরা যাহাই করি না কেন, ইংরেজকে লড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই না করাই স্থির।

---

* পাটনা।

তবে নৌকা আটক করিয়া কেন লড়াই বাধাই ? ফলে সে সত্য কথা। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সেরাজউদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে !

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল।

পরে কহিল, "কুল্‌সম্, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করতে পারিস্ ?"

কু। কি ? ইলিস মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে ?

দ। দূর। তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে হাতীর দুই পায়ের তলে ফেলে দিবেন।

কু। টের পেলে ত ? এত আতর গোলাব সোণা রূপা চুরি করিলাম, কই কেহ ত টের পেলে না ! আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়ে মানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমন ত দেখিলাম না।

দ। দূর ! আমি খোজা খান্‌সামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মত নহেন। তিনি না জানিতে পারেন কি ?

কু। আমি না লুকাইতে পারি কি ? কি করিতে হইবে ?

দ। একবার গুর্‌গণ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম্ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস্ ?"

কু। পত্র কে দিবে ?

দ। আমি।

কু। সে কি ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ?

দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ুর দুইটা আপন আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষীরা আহারে মন দিল !

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম্ বলিল, "কাজ অতি সামান্য। এক জন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু এ কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব। যা হোক, তোমার কর্ম্ম তুমিই জান। আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুল্‌সম্ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুর্‌গণ খাঁ

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুর্‌গণ খাঁ।

এই সময় বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুর্‌গণ খাঁ এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আরমাণি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমত ভরসা ছিল যে, তিনি গুর্‌গণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুর্‌গণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুর্‌গণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুর্‌গণ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতাস্থ কয়েক জন আরমাণির পত্র। পত্র পাঠ করিয়া, গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপ্‌দার আসিয়া দাঁড়াইল, গুর্‌গণ খাঁ কহিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে?"

চোপ্‌দার কহিল, "আছে।"

গুর্। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে। এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ?

চোপ্‌দার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গুর্। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাক।

তখন গুর্‌গণ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখন কোন্ পথে যাই? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্রবিশেষ—যে যত ডুব দিতে

পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির; আমিই বাঙ্গালার কর্ত্তা। আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা? কে কর্ত্তা? কর্ত্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম; আমি মীরকাসেমের গোলাম—আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম! বড় উচ্চপদ! আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা না হই কেন? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? ইংরেজ! একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি—মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না—যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মসনদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি—মই ফেলিয়া দিতে পারি। কণ্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে—আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাদের তাড়াইব। এখন মীরকাসেম মসনদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন?"

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুর্‌গণ খাঁ তাহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্‌গণ খাঁ বলিলেন, "আজি অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম্ম কেন করিলে?"

দলনী বলিল, "দুঃসাহসিক কিসে?"

গুর্‌গণ খাঁ কহিল, "তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে আমাকে—দুই জনকেই বধ করিবেন।"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমত ভরসা করিতেছ! এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। তুমি যে আমাকে চেন, বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা এ পর্য্যন্ত আমরা

কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে? বলিবে, এ কেবল বাঁচিবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।

দ। নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে এ কথা কি সত্য?

গুর্। এ কথা কি তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না?

দ। পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত। এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। কেন?

গুর্। তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

দ। আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি? না বালিকার ন্যায় কাজ করিয়া থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায়স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে বালিকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে?

গুর্। হউক। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি। হয়, হউক না।

দ। আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন?

গুর্। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দ। এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে?

গুর্। ইংরেজেরা কয় জন গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে?

দ। সেরাজউদ্দৌলা তাহাই মনে করিয়াছিলেন। যাক—আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি, আমার মনে হইতেছে যে, কোন মতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না।

গুর্। এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দ। "আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি।" বলিয়া, দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুর্‌গণ খাঁ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসন-চ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীরকাসেম আমার স্বামী।"

গুর্‌গণ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি এক দিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।"

দলনী ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল। গলদশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল,—"তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই; নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ। আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমি জানিও, আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুর্‌গণ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে, সে মীরকাসেমের হইয়াছে। ভ্রাতা বলিয়া তাহাকে স্নেহ করিলে করিতে পারে, কিন্তু সে মীরকাসেমের প্রতি অধিকতর স্নেহবতী। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

এক জন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গণ খাঁ তাহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়।

অশ্বারোহণে দূত আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছিল, দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্নবল্লীবৎ, ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না।"

কুল্‌সম্ বলিল, "ফিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান হইবে।"

সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্ম্মরিত হইতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল, "কুল্‌সম্!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দলনীর কি হইল

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী, রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবেন?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। না হয় মরিব, ক্ষতি কি?

কু। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

দ। এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?

কু। দরবারে।

দ। প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরিবার কালে তাঁহাকে বলিতে পাইব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানে শীঘ্র ধরা পড়িব।

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষ-মূর্ত্তি গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা বৃক্ষতলস্থ অন্ধকারমধ্যে গিয়া লুকাইল। পুনশ্চ সভয়ে দেখিল, দীর্ঘাকার পুরুষ, গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয়-বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল। দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি আরও অন্ধকারমধ্যে লুকাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল। বলিল, "এখানে তোমরা কে?" এই কথা বলিয়া, সে যেন আপনা আপনি, মৃদুতর স্বরে বলিল, "আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?"

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের ভয় জন্মিয়াছিল, কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর

হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। কুল্‌সম্ বলিল, "আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে ?" পুরুষ কহিলেন, "আমরা ? তোমরা কয় জন ?"

কু। আমরা দুই জন মাত্র।

পু। এ রাত্রে এখানে কি করিতেছ ?

তখন দলনী বলিল, "আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে ?"

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, "অতি সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে, তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।"

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে ?

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।"

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ্ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া দলনী ও কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া "রামচরণ" বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া, ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী তখন রামচরণকে বলিলেন, "তুমি গিয়া শয়ন কর।" শুনিয়া রামচরণ একবার দলনী ও কুল্‌সমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, রামচরণ সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। ঠাকুরজী, এত রাত্রে দুই জন যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া আসিলেন কেন ? এই ভাবনা তাহার প্রবল হইল। ব্রহ্মচারীকে রামচরণ দেবতা মনে করিত—তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়াই জানিত—সে বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল না। শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, "বোধ হয়, এই দুই জন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জ্বালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।"

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।"

হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না। ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে, পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।"

দ। পত্র লইয়া যাইবে কে?

ব্র। আমি পাঠাইয়া দিব।

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন। ব্রহ্মচারী রামচরণকে আবার উঠাইলেন। রামচরণ কাগজ কলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, "এ গৃহ আমার নহে; কিন্তু যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন—কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।"

অগত্যা স্ত্রীলোকেরা তাহা স্বীকার করিল। লিপি সমাপ্ত হইলে, দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন।

মুঙ্গেরের যে সকল রাজকর্ম্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত। সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না; এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।" মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কাল যাপন কর।"

রামচরণ প্রভাতে আসিয়া দেখিল, সহমরণের কোন উদ্যোগ নাই।

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখন "অভাগী," কখন "পোড়ারমুখী," কখন "চুলোমুখী" ইত্যাদি প্রিয় সম্বোধনে শৈবলিনীকে অভিহিত করিয়া স্বামীর কৌতুক বর্দ্ধন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তার পর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তার পর কিছু দিন অমনি অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। তখন সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া গহনা পরিতে বসিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসি-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন। শৈবলিনীর বিপদ্‌কালে যে শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী। তাঁহার মাতা রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য। সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল; তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশপূর্ব্বক পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।" সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী কন্যার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন। সুন্দরী, রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ! শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাসেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা; তাঁহার কাছে বিশেষ

প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমীদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশবিখ্যাত নাম। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া, প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, "আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, "এত দিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?"

সু। কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?

প্র। কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।

সু। তুমি উপকার করিবে কি না, তা জানিব কি প্রকারে?

প্র। কেন, তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?

সু। জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যায়।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

সুন্দরী কিছু দিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া, শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। এক দিন রূপসী বলিল, "তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?"

সুন্দরী বলিল, "তাঁর মুণ্ডপাত করিব ব'লে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব ব'লে—তাঁর মুখে আগুন দিব ব'লে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী!"

সুন্দরী উত্তর করিল, "সেই ত আমায় কুঁদুলী করেছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। সেই জন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট্ সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিস্‌কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব এক জন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্ণর বান্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ সকল বৃত্তান্তের সম্বাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গের পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গের আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইলেন, কিন্তু এমত সময়ে গুর্‌গণ খাঁ নৌকা আটক করিলেন। তখন আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অদ্য আমিয়টের সঙ্গে ফষ্টরের এই কথা স্থির হইল যে, যদি নবাব নৌকা ছাড়িয়া দেন ভালই; নচেৎ কাল প্রাতে ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা ফেলিয়া পাটনায় চলিয়া যাইবেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আকারে বড়

বৃহৎ—আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েক জন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েক জন সিপাহী। এইখানিতে অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুরগণ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর এক জন "তেলিঙ্গা" নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্র, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুম্‌দার ?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, এক জন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমত সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র, ভড়ের সিপাহীরা "কিয়া হৈ রে ?" বলিয়া গোলযোগ করিয়া উঠিল। নৌকার অপরাপর লোক জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

লরেন্স ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারি দিক্ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃত দেহ ভাসিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড় বনের দিকে অল্প ধূমরেখা দেখিলেন। আরও দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকার লোক সকল বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; নগরমধ্যে আলো জ্বলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী-শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্তপ্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলকমধ্যে ফষ্টর এই সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর ঈষত্তরল ধূমরেখা দেখিয়া, ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া

সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ফষ্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বনান্তরালে লুক্কায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, যে শত্রু অদৃশ্য থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাঁহাকেও নিপাত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন করিয়াছিলেন—কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে কসাড় বনের ভিতর অগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল—আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায়, গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়ে, কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া, বজরার বন্ধনরজ্জু সকল কাটিলেন। সেখানে জল অল্প, স্রোতঃ মন্দ বলিয়া নাবিকেরা নঙ্গর ফেলে নাই। ফেলিলেও লঘুহস্ত, বলবান্ প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত না। প্রতাপ এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনাগুলি বর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরীর পতন, ফষ্টরের বাহিরে আসা, তাঁহার পতন, এবং প্রতাপের নৌকারোহণ, এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও আসিল।

আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির জলে গিয়াছে। এক জন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল। আর কেহ অগ্রসর হইল না। সেই লগিতে জলতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা ঘুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন "তেলিঙ্গা" সিপাহী নৌকার ছাদের উপর জানু পাতিয়া, বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন। এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী—বোধ হয়, তোমাদের কয়জনকে একেলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড়

ধরুক। আর আর সকলে যেখানে যে আছ, সেইখানে থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।”

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ভড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুক হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে, নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে সে শব্দ তখনই নিবারিত হইল।

তখন ভড় হইতে জন কয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গিতে উঠিয়া, বজরা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুই জন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া, ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া এবং ভড়ের সিপাহীগণ কসাড়বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বজ্রাঘাত

সেই নৈশ-গঙ্গাবিচারিণী তরণী মধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর একটিতে শৈবলিনী এবং তাহার দাসী। শৈবলিনী এখনও বিবি সাজে নাই—পরণে কালাপেড়ে সাড়ী, হাতে বালা, পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দরপুরের দাসী পার্ব্বতী। শৈবলিনী নিদ্রিতা ছিল—শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারি পাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণনির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফষ্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া

জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তাহার গতিশক্তি রহিত। এদিকে শূকর বলিতেছে, "আমার কাছে আইস, আমি হাঁস ধরিয়া দিব।" প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিল। অসম্পূর্ণ—ভগ্ন নিদ্রার আবেশে কিছুকাল বুঝিতে পারিল না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিল—কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার ভিতরে আসিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। পার্ব্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমাদেরই পাপের ফল।

শৈ। সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল কি? সাহেবেরই পাপের ফল।

পা। ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ্ আমাদেরই।

শৈ। কি বিপদ্? এক ডাকাতের সঙ্গে ছিলাম, না হয় আর এক ডাকাতের সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতের হাত এড়াইয়া কালা ডাকাতের হাতে পড়ি, তবে মন্দ কি?

এই বলিয়া, শৈবলিনী ক্ষুদ্র মস্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বেণী আন্দোলিত করিয়া, একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল। পার্ব্বতী বলিল, "এ সময়ে তোমার হাসি আমার সহ্য হয় না।"

শৈবলিনী বলিল, "অসহ্য হয়, গঙ্গায় জল আছে, ডুবিয়া মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি হাসিব। এক জন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা পড়া করি।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না; তাহারা আপনারাই আসিবে।"

কিন্তু চারি দণ্ডকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমাদের কি কপাল। ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।" পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া, এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ লাগিয়া রহিল। পরে, তথায় কয়েক জন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কাঁমরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে, পার্ব্বতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে,—কোথায় যাইব ?"

রামচরণ বলিল, "আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিল। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিল। পার্ব্বতী সঙ্গে যাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে নিষেধ করিল। পার্ব্বতী ভয়ে নৌকার মধ্যেই রহিল, রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্‌সম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না। উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী ?" রামচরণ সে কথা কাণে তুলিল না।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পাল্কী জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাইও। রামচরণ পথে ভাবিল—"এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কি না ? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না ? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব ? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব ? সে সকলে কাজ নাই ; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এদিকে প্রতাপ, পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন। পূর্ব্বেই সকলে তাঁহার হাতের বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।"

রামচরণ আসিয়া দেখিল,—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না। সম্ভবে কি না তাহা আমরা জানি না,—আমরা যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি লিখিতেছি। রামচরণ শৈবলিনীকে জাগরিতা না করিয়া প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি ঘুমাইতেছেন—ঘুম ভাঙ্গাইব কি ?" শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইল—মনে মনে বলিল, চাণক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়াছেন ; নিদ্রা স্ত্রীলোকের যোল গুণ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও ঘুমাও—পরিশ্রমের একশেষ হইয়াছে। আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।"

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্ব্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়নকক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেত-বারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল-শ্বেত-পদ্ম-রাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমত নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রা যান নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তা বশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশের পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে পান নাই। প্রতাপ বন্দুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্দুকটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অন্যমনা হইয়াছিলেন—সাবধানে বন্দুকটি রাখা হয় নাই ; বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ ? কে তুমি ?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ জল আনিয়া, মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে

মুখ শিশির-নিষিক্ত-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছ সকল ঋজু করিয়া, ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মাবলম্বী শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। প্রতাপ দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কাণে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনাবাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হন নাই। হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি, আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল?"

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীত ভাবে, প্রায় বাষ্পগদ্গদ হইয়া বলিলেন, "যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই ; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল,—"আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম, ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম, ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে, এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়া-ছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতিদূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লা খাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথম যে সেনা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহারা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া, ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গালাতে তেলিঙ্গা বলিত; কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজ-সেনা-ভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্য থাকিয়া, প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল,—বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল—কুঞ্চিত ভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারি জন সিপাহী এবং এক জন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন যে, দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া এখনই আমার নিকটে লইয়া আইস। বকাউল্লা কহিল, "তবে দুই জন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ সয়তান—এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ নামক দুই জন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন।

গমনকালে গল্‌ষ্টন্‌ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়াছিলে?"

বকাউল্লা বলিল, "না।"

গল্‌ষ্টন্‌ জন্‌সন্‌কে বলিলেন, "তবে বাতি ও দেশলাইও লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

জন্‌সন্‌ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের রণ-যাত্রার গভীর পদবিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাতে পশ্চাতে চারি জন সিপাহী, নাএক ও বকাউল্লা চলিল। নগর-প্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে, সুশিক্ষিতহস্ত। বস্ত্রকুঞ্চনে, অঙ্গরাগকরণে, বড় পটু। রামচরণের মত ফরাশ নাই—তাহার মত দ্রব্যক্রেতা দুর্লভ। কিন্তু এ সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ—অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে ধরাশয়ন করিয়াছিল। বন্দুকে রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাঁহার পরিচয় ফষ্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি সময়োপযোগী গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, "এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? ঠাকুর মশায়? বোধ হয়; কিন্তু যাহোক একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।"

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুই জনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে "ইণ্ডিল মিণ্ডিল" বলিত—এখনকার লোকে বলে, ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, "রসো, বাবা! দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা।"

রামচরণ আরও ভাবিল, "বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্ত্তাকেও ডাকি।" এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এই সময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্‌ বলিল, "অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

গল্‌ষ্টন্‌ লাথি মারিল। দ্বার, খড় খড়, ছড় ছড়, ঝন ঝন করিয়া উঠিল। রামচরণ

দৌড়িল। শব্দ প্রতাপের কাণে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সেবার কবাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্‌সন্ লাথি মারিল। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" বলিয়া ইংরেজেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, "অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আম্‌বাতের কুঠি থেকে।" রামচরণ আমিয়টের পরিবর্ত্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আট জন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয় জন স্ত্রীলোক আছে তাহাদের দশা কি হইবে! তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিত বর্ত্তিকা এক জন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্ত্তিকার আলোকে ইংরেজেরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল, "হাঁ, ইহারাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজেরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ, চরণে আহত হইয়া, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক, এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?" গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপরে বন্দুক হাতে প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জুনাব, এই ব্যক্তি সরদার।"

জন্‌সন্‌, প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্‌ষ্টন্‌ আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্‌ষ্টন্‌ পতিত রামচরণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা?" জন্‌সন্‌ দুই জন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকেও লইয়া আইস।" দুই জন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্‌ জাগ্রত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মুক্ত করিয়া এই সকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজেরা, প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক, অকস্মাৎ ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে, দলনীর নীলমণিপ্রভ চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি!" গল্‌ষ্টন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত! কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্‌সন্‌ ও গল্‌ষ্টন্‌ ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাদের সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্‌ মহা ভীতা এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগেব সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাপের বিচিত্র গতি

যেমন যবনকন্যারা অল্প দ্বার খুলিয়া, আপনাদিগের শয়নগৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল। তিন জনই স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীজাতিসুলভ কুতূহলে তিন জনেই পীড়িতা; তিন জনেই ভয়ে কাতরা; ভয়ের স্বধর্ম্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে। শৈবলিনীও আদ্যোপান্ত দেখিল। সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয়

নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ্ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই বা কিসে? এত দিন জলে বাস করিলাম, কই এক দিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু আমিও ত কোন উদ্যোগ করি নাই। মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষে মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না। প্রতাপের কি হয়? যা হৌক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?”

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীরপার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। তুলসী-মঞ্চ—তাহার চারি পার্শ্বে পরিষ্কৃত, সুমার্জ্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জ্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল! কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ, শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন; কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম, পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধি বায়ু, ভীমাতটে সেবন করিতেন; জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফাটিক বিক্ষেপ দেখিতেন, তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত। শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব; মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট; কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষ-জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব। সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে; জানিতাম না যে,

ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।" পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর এ কথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু এক দিন সে এ কথা বুঝিবে; এক দিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না। পরে সে ভাবিতে লাগিল, "পরকাল? সে ত যে দিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেই দিন গিয়াছে। যিনি অন্তর্যামী, তিনি সেই দিনেই আমার কপালে নরক লিখিয়াছেন। ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক—নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন? নহিলে দুই চক্ষের বিষ ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এত কাল বেড়াইলাম কেন? শুধু কি তাই, বোধ হয়, যাহা কিছু আমার ভাল, তাহাতেই অগ্নি লাগে। বোধ হয়, আমারই অন্য প্রতাপ এই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে,—আমি কেন মরিলাম না?"

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; অধর দংশন করিল; ক্ষণকাল জন্য তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুল্য মুখ, রুষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল। সে আবার বলিল, "মরিলাম না কেন?" শৈবলিনী সহসা কটি হইতে একটি "গেজে" বাহির করিল। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল। শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার ফলক নিষ্কোষিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৎসহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বলিল, "বৃথা কি এ ছুরি সংগ্রহ করিয়াছিলাম? কেন এত দিন এ ছুরি আমার এ পোড়া বুকে বসাই নাই? কেন,—কেবল আশায় মজিয়া। এখন?" এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল। ছুরি সেই ভাবে রহিল। শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, "আর এক দিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফষ্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম। সে দিন তাহাকে মারি নাই, সাহস হয় নাই; আজিও আত্মহত্যায় সাহস হইতেছে না। এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব। দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল,—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব? না—আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ

করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি! পুঁতিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। এক বার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল! দেখিল, চন্দ্রশেখর।

তৃতীয় খণ্ড

পুণ্যের স্পর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে, এক জন পরমহংস কিয়দ্দিবস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীত ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধ পুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন, বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখতুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, সার্ব্বভৌম মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। দানবপীড়িত, অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সুরলোকও দুঃখপূর্ণ। শেষে, মনোমোহিনী বাক্‌শক্তির দৈবাবতারণা করিয়া, অনন্ত, অপরিজ্ঞেয়, বিধাতৃহৃদয়মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়া দুঃখিত হন না? তবে দয়াময় কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্ত কাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল, তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্ব্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্পৃহাশূন্য—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে পারি না—

তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না; কেন না, তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ।"

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখনিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।" পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্ত্তন করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দ স্বামী শতমুখে পরোপকার ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি মন্থন করিয়া অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন। শব্দসাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর, বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠনির্গত, উচ্চারণকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্য সকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাক্যসকল কখন মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখন বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল! ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন পরিচয়

এদিকে যথাসময়ে, ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে ও কুল্সমকে লইয়া যাইবার জন্য প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিল, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়। কেবল, সৎকার্য্য কোন আশায় কৃত হয় না। যাঁহারা স্বর্গের আশায় সৎকার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী, আপত্তি না করিয়া, শিবিকা-রোহণ করিল।

খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে। আরও দেখিলেন যে, এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গলষ্টন্ ও জনসন্ দলনী ও কুল্‌সমকে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিলেন। তাহারা কে, তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু যখন নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল, এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন যে, বেগমকেই ইংরেজেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিল।

নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

শৈ। দেখিয়াছি।

ন। কোথায় দেখিলে?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায়? প্রতাপ রায়ের বাসায়?

শৈ। আজ্ঞা হাঁ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, জান?

শৈ। দুই জন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

শৈবলিনী পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর পুনরুক্ত করিলেন। নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া, শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন। গুর্‌গণ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান?"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল?

শৈ। এক জন চাকর ছিল, তাঁহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জান?"

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলিল, "না।"

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারে চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিল।

নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।"

শৈবলিনী বলিল, "আমার গৃহ কোথা—কোথা যাইব?"

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন। পরক্ষণে বলিলেন, "তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

শৈ। আমার স্বামীর কাছে। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা,

আপনার কাছে নালিশ করিতেছি ;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ; হয়, আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া, ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব। সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

সংবাদ আসিল, গুর্‌গণ খাঁ হাজির। নবাব, শৈবলিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন পথ

নবাব গুর্‌গণ খাঁকে, অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ; কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল ?"

গুর্‌গণ খাঁ কহিলেন, "যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে।—আর—"

নবাব। আমিয়ট কাল রাত্রে এই শহর মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব ?

গুর। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব ?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্। তাহারা এ শহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি ! বিনা এত্তেলায় ?

গুর্। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক এক জনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি ? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চরন্দার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে।

আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেই জন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে শুনিয়াছ ?

গুর্। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায় ?

গুর্। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সম্বাদ দাও নাই কেন ?

গুর্। আমি এই মাত্র শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুর্গণ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুর্গণ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল ; দ্বিতীয়, আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব, গুর্গণ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্গণ খাঁ যখন যান, নবাব, তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই, "যত দিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, তত দিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীর মুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে, এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া, হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে কৌশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দিও। পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে যাউক—অগ্রে পঁহুছিবে।

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত যোড় করিয়া কহিল, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি ?"

নবাব। ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদ পৌছিবে। বিশেষ যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া, কি জানি যদি ইংরেজেরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে। মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে কৌশলে ধরিবে।

শৈবলিনী বুঝিল যে, তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাঁহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, তাঁহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত যোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না—তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চ হাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "প্রভু! না পারি আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত ভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, "মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই—নহিলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্যসিদ্ধি করিবে।" শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে?"

শৈ। স্ত্রীলোক, একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে এক জন দাসী, এক জন রক্ষক, আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব, চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দিন নামে এক জন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ, এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল, নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও। এবং এক জন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার

দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।"

মসীবুদ্দিন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে?"

নবাব। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া, বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া, দেখিয়া, সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া পিছু হটিয়া সেলাম করিল। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি, স্মরণ রাখিও। কখন যদি মুস্কিলে পড়, তবে মীরকাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিল। মনে মনে বলিল, "আসিব বৈকি? হয়ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।"

মসীবুদ্দিন পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল। এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বারুদ, পিস্তল, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মসীবুদ্দিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, এ সকল কি হইবে। মনে মনে করিল যে, এ দোসরা চাঁদ সুলতানা।

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যত দূর দেখিতেছি নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীর শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা। সিপাহীদ্বয়, গঠিত মূর্ত্তির ন্যায়, বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে, স্নিগ্ধ স্ফাটিক-দীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ আসন, শয্যা, চিত্র, পুত্তল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুই জনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। এক জন সুরাপান করিতেছেন, ও পড়িতেছেন। এক জন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরব বিদীর্ণ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জন্‌সন্‌কে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্‌সন্ বলিলেন, "কার কিস্তিমাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে; কিন্তু সেই জলভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারি দিক্ দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমের মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তরমধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?" স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমিয়ট পুনঃ পুনঃ তাহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাসে

বজ্‌রার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ষ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ষ্টন্‌ প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত ; কিন্তু ইংরেজ মহলে হিন্দিতে তাঁহার বড় পশার। গল্‌ষ্টন্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল।

গ। কেন কাঁদিতেছ ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল।

গ। তোমার বাড়ী কোথায় ?

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?

শৈবলিনী তদ্রূপ।

গল্‌ষ্টন্‌ হারি মানিল। কোন কথার উত্তর দিল না, দেখিয়া ইংরেজেরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে কথাও বুঝিল না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না— আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙ্গালির মেয়ে। এক জন বাঙ্গালিকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালি মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের এক জনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন ?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল।"

সাহেবেরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায় ?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিল, "ক্ষিদে পেয়েচে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবর্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে,

কেন না শৈবলিনী পরমা সুন্দরী। শৈবলিনী কিছুই খাইল না। খানসামা বলিল, "খাও না।" শৈবলিনী বলিল, "ব্রাহ্মণের মেয়ে ; তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন ?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই ?"

খানসামা বলিল, "এক জন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী এক জন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা, যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্‌সীতে, একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে পিছে সান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ওগো ঠাকুর !" প্রতাপ বলিল, "কেন ?"

খা। তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে ?

প্র। কেন ?

খা। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। তুটি দিতে পার ?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না।

বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা সান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল বেড়াবেড়ি কে করে ? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা ; কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খানসামা হুকুম করাইতে আমিয়ট সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে

মুখ অমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট দেখিয়াছিলেন যে, এই "জেন্টু" স্ত্রীলোকটি নিরুপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট জমাদ্দার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। সান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায় পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। সান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে, দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষপ্রফুল্ল,—মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতিলঘুস্বরে, কাণে কাণে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল ?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কাণে কাণে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল, "আগে তুমি যাও, নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না। এই বেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাত খাইব না।" তখনি আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল ? কি হইল ?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইল। সান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা ! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত

করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পাল্কী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তারণপটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

"কয়েদী ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতের সান্ত্রী ডাকিল। এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব? তুই বাপ্ হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।"

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল যে, যে নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার ছাদে, জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্দ্ধশয়নাবস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিল—দেখিল, পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! হামারা বিবি!" ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচ জন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! ফষ্টর সাহাব ইনাম দেগা।" প্রতাপ মনে মনে বলিল, "ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম দিয়াছি—ইচ্ছা আছে আর একবার দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, "আমি ধরিতেছি—তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে সাঁতার

দুই জনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর-সাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।

তুমি গ্রাহ্য কর, না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দেও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেতমুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শ্রান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণ-পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি?

প্র। আর এক দিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?" শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন, প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও, প্রতাপ? যা বল তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ, প্রতাপ?"

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কলকল চলচল জলভঙ্গরব-মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারি পাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণা-মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

"কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি ?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায় ?

প্র। তবে আমার শপথ ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল। দুই জনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিল।

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কতকাল পরে প্রতাপ ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায় ? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি ?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল, "তোমার শপথ—কি বলিব ?"

প্র। শপথ কর, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর ; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল, "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ ?"

প্র। আমি !

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুই জনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি ? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন ?" প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাহি না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল, "প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল। কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ গদগদ কণ্ঠে বলিল, "চল, তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। ছিপ নিকটে ছিল। উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায় আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। তাহারই গুলিতে যে ফষ্টরের আঘাত ও সান্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মুনিব বড় বদ্জাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন ?

আমিয়ট। কি তামাসা ?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায়, বুঝায় যে আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি এক প্রকার এদেশী খোষামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোষামোদ করিয়া "মা বাপ" "ভাই" এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোষামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি ?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিছু দিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব।"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে, রামচরণ অস্ফুট স্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতোপরে

আজি রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষ রাত্রে ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে

লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে? বিক্টর হ্যুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসস্বভাব ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফাটিকনিন্দিত জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃপ্রফুল্ল চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জ্বলিতে থাকে; ইহার গৃহে কত মহামূল্য মুক্তা প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস, শোণিতশোষক সহস্র মুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া তাহার শোণিত-শোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এ জন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যত দূর পারিল, তত দূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে, পাছে, অনুসন্ধানপ্রবৃত্ত কেহ তাহাকে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতাগুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে ভগ্ন শাখাগ্রভাগে, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কণ্টকময়,

হিংস্রকজন্তুপরিবৃত পার্ব্বত্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এত কাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত পিপাসাপীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতা গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিল।

এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক, এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। এক বিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তার পর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত মস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর উরুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।

তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনা-পূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকীরিট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন

মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্ব-শক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমত সময়ে সেই মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে; কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিল। দেখিল, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্রিত করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে, এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ কি করিলেন

প্রতাপ জমীদার, এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমীদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয়, কোন জমীদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না; কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্য্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশমর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্ম্মান্ বা স্কন্দেনেবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্য্যাদা ছিল; তাঁহারা গোচোর; বিরাটের উত্তরগোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমীদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্য্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমন কি, দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রিপ্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি। আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য; কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না?

তার পর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য এ কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তার পর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি?

তার পর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাঠ হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে,

সেইখানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা রিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত দূর তাহা করিব।

তার পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব।

অতএব আমি ইহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোষামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশে আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইল, কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব?"

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।

শুনিয়া গুরগণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈবলিনী কি করিল

মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্রপথে বিন্দু বিন্দু বারি

গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে ?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। ভয় ? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না, জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল—আর যাইবে কি ? কিসের ভয় ?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে, পালিত করিয়াছিল, সেই দিন, বা তাহার পূর্ব্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল ; যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে ; চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণশ্রান্তি ; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে ? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দু-কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃত জীব সকল—চর্ম্ম মাংসাদি বর্জ্জিত—কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্ব্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে, রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলেই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার

দিবে ? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহনির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল ; রুধিরস্রোতঃ বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর ! রক্ষা কর !" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্ব্বতবিদারণ, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নিগর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখন বা শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায় ! রক্ষা কর !" তখন অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর ! এ নরক ! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই ?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "আছে।" স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, "আমার কি হবে ! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই ?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে ? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায় ?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর—আমি শিখাইব।

শৈ। তুমি কে?

উত্তর—ব্রত গ্রহণ কর।

শৈ। কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর এক খণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি করিব?"

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ—গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈ। আর?

উত্তর—জটাধারণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি?

উত্তর—মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায় ?"

উত্তর—কেন ?

শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না ?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে ?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কত দিন বাঁচিব ? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই ?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না ? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও ; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধানিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইত। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—

সর্ব্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাত দিন সাত রাত কেবল স্বামিমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতে নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত ; চিত্ত অন্যচিন্তাশূন্য ; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায়, অবসন্ন শরীরে, অবসন্ন মনে, একাগ্রচিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি ? না দিব্য চক্ষু ? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর ! এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন ! ইহার কাছে প্রতাপ ? ছি ! ছি ! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা ! ঐ যে নয়ন—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্র জ্যোতিঃ স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু ? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম ! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু,—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম ! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কূল হারাইলাম ? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না ? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—

প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফল মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামি-দর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণগুণ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে। আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্ব্বতমধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল,

কুণ্ডলমধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে ; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ভিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা কিন্নরাদি মেঘতরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী স্বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পৃষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইতেছে। কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন, কত দেব দেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে ; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীশবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—"দেখ, ভগিনি, দেখ, মনুষ্য-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!" কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে ; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে ; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, তার পর আরও উর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও উর্দ্ধে উঠিতেছে। অতি উর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল, ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে,

এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও। এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জ্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—"কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবন-সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গল! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে না--আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূরিল। সেই দুরন্ত নরক-রব সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাতকূজন শুনা যাইতেছে—কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল, তাঁহার মস্তকোপরে, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিলেন, চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারী-বেশে চন্দ্রশেখর!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল; মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া

গেল ; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃপতিত হইয়া বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন ?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন সম্বরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্প দিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "অল্প দিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে ? কেন বিশ্বাস করিবে ? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি ?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হসিল।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন ; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া, মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

শৈবলিনী হাতযোড় করিল ;—বলিল, "আর একবার বসো! বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।" আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যায় পাপ আছে কি ?" শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও ?

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, "মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈ। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

চন্দ্র। সে কি ?

শৈ। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রিদিন নরক-স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল—নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ ?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভয় পাইতেছ ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রখিলে কে রাখে ?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে ?"

শৈ। সেই নরক !

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণ পরে বলিল, "আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব ? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল, গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে উৎকীর্ণা

—অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল, সুন্দরী অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষপরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল, সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল—সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ, সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার! দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কণ্টকের রজ্জুহস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিকবেত্রে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষ-পরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার্! মার্! আমি বারণ করিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই! মার্! মার্! যত পারিস্ মার্! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার্! মার্!" শৈবলিনী যুক্তকরে, উন্নত আননে, সজল-নয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে, সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে, "মার্! মার্! অসতীকে মার্! আমি সতী, ও অসতী! মার্! মার্!" শৈবলিনী, আবার সেইরূপ দৃষ্টিস্থির লোচন বিস্ফারিত করিয়া বিশুষ্ক মুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন, "শৈবলিনি! আমার সঙ্গে আইস!"

প্রথমে শৈবলিনী শুনিতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতস্বরে বলিল, "চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল!" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহাদ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল; পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন। মুখে জলসেক করাতে, এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীতা হইল। বলিল, "তুমি কে?" চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

"স্বামী আমার সোণার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে ;
তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে ?

তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনী !"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে ? রসো রসো ! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। এক দিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল ; মেয়েটি ব্যাঙ্ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্‌টিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হাঁ গা সাহেব ! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর গদগদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব ! এ কি করিলে ? এ কি করিলে ?"

শৈবলিনী গীত গায়িল,

"কি করিলে প্রাণসখী, মনচোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে,"

বলিতে লাগিল, "মনচোর কে ? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে ? চন্দ্রশেখরকে। ভাসিল কে ? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি ? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল।"

শৈবলিনী বলিল, "আমাকে মারিবে না !"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখন হাসিতে লাগিল—কখন কাঁদিতে লাগিল—কখন গায়িতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড

প্রচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমিয়টের পরিণাম

মুরশিদাবাদে আসিয়া, ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীরকাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সম্বাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্লমনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি, দূরে অলক্ষিত-রূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং অসদ্ভাব যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি? আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে নৌকায় দলনী ও কুল্‌সম্ বন্দিস্বরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সম্বাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্‌সম্ কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, "কুল্‌সম্—শুনিতেছ? বুঝি মুক্তি নিকট।"

কু। কেন?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্ না; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে?

দ। নহে কেন? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে

অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ নাই।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছে না। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিল। বলিল, "আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতে পারিস্?"

কু। তা ত বলিয়াই রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে; নহিলে ভয় কি?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, "আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না। ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না?"

কুল্‌সম্ রাগ না করিয়া হাসিয়া, বলিল, "যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও?"

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, "তাও কি সাধ না কি?"

কুল্‌সম্ গম্ভীরভাবে বলিল, "কপালের লিখন কি বলিতে পারি?"

দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল। কিন্তু কিলটি আপাততঃ পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল না। দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উত্থিত করিয়া—কৃষ্ণকেশগুচ্ছ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা পাইতেছিল, তাহার নিকট কমল-কোরকতুল্য বদ্ধ মুষ্টি স্থির করিয়া, বলিল, "তোকে আমিয়ট তুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল্ ত?"

কু। সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য। সাহেবদিগের ইচ্ছা, যত দিন আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। জগদীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, "জগদীশ্বর করুন, তুমি শীঘ্র মর।"

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা

করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। আমার এমন মন হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।"

এদিকে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্‌সন্ বলিলেন, "এখানে আমরা তত বলবান্ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না?"

আমিয়ট বলিলেন, "যে দিন, এক জন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শত্রুহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও। এবং দুই জন সিপাই সঙ্গে দাও। বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

সিপাহীগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল। ঝাঁপের বেড়ার নৌকায় সহজেই ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহী এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্‌সম্ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুই জন সিপাহী সঙ্গে ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সম্বাদ দিতে গেল।

এ সম্বাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণবশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারটা বন্দুকের শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলিবর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতরে গুলি প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে বড় হুলস্থূল পড়িল। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থ গৃহাদির অন্তরালে লুক্কায়িত; ইংরেজ এবং তাহাদিগের সিপাহীগণ নৌকামধ্যে লুক্কায়িত। এরূপ যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অন্য ফলের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইংরেজেরা ভীত হইল না।

স্থির চিত্তে, নৌকামধ্য হইতে ক্রুতাবতরণপ্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে, এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনশ্রেণীর উপর যবনশ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট বলিলেন, "আর আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করি।"

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিন জন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূলবিভিন্নের ন্যায় নৌকারূঢ় যবনশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলা মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, কল কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস, বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।"

তখন তরবারি হস্তে তিন জন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন যবন, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, "কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।"

আমিয়ট বলিলেন, "মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

"তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্টন সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বার জন যবনে গল্‌ষ্টনকে ঘেরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ, বহুলোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবার সেই

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজরা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, ফষ্টরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠাইয়াছিল; সেই নৌকার পাশ দিয়াই ফষ্টরের দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা ফষ্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সম্বাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট সেই নৌকার উপর আসিলেন। দেখিলেন, ফষ্টর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মস্তিষ্ক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতনা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফষ্টরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। আমিয়ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লার প্রদত্ত সন্ধান মতে, ফষ্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন। যখন আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফষ্টরকে সেই নৌকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফষ্টরের পরমায়ু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পরমায়ু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমান-হস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রুগ্ন—বলহীন—তেজোহীন,—আর সে সাহস—সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য, বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসলমান গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিল। এ স্থলে ফষ্টর যথার্থ অনুমান করিয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে যবনের নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রান্ত বুদ্ধিতে নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল যে, নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া পলাই। আবার ভাবিল, পলাইতে পারিব না—আমার সে বল নাই। আবার ভাবিল, জলে ডুবি—আবার ভাবিল,

জলে ডুবিলে বাঁচিলাম কই। আবার ভাবিল যে, এই দুইটা স্ত্রীলোককে জলে ফেলিয়া নৌকা হাল্কা করি—নৌকা আরও শীঘ্র যাইবে।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে, দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ?"

দলনী বলিল, "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা,—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল? কিছুই না, কেবল ফষ্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ,—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল। দলনী যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় সন্দেহ করিত। কিন্তু যে যাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সে তাহার নামেই মুগ্ধ হয়, আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাঙ্মুখ হয়। দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দ। আমি বারণ করিব।

ফ। তোমার কথা শুনিবে না। তোমাদের দেশের লোক স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্য করে না।

দলনী তখন ব্যাকুলতাবশতঃ জ্ঞান হারাইল—ভাল মন্দ ভাবিয়া দেখিল না। যদি ইহা নিজামতের নৌকা না হয় তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নৌকা যে নিজামতের নহে, সে কথা তাহার মনে আসিল না। ব্যাকুলতাবশতঃ আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিল, বলিল, তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।

ফষ্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুল্‌সম্ বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমার কপালে কি আছে বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানা শুনা লোক আছে।"

দলনী বলিল, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কুল্‌সম্‌। তুমি বাঁচিলে ত ?

কুল্‌সম্‌ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না।

ফষ্টর কুল্‌সম্‌কে বলিল, "কি জানি, যদি তোমার জন্য নৌকা পিছু পিছু আইসে। তুমিও নাম।"

কুল্‌সম্‌ বলিল, "যদি আমাকে ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া, যাহাতে নৌকা-ওয়ালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব।"

ফষ্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুল্‌সমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতিক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে, নৌকা এইবার তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে ; কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, এই সন্দেহে দলনী অঞ্চল উর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। তথাপি নৌকা ফিরিল না। বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দলনীর চমক হইল—এ নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম! অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফষ্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত হইয়াছিল—তথাপি সে কূলে কূলে দৌড়িল, তাহা ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল। কিন্তু বহুদূরে দৌড়িয়া নৌকা ধরিতে পারিল না। পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষার নববারি-প্রবাহের কলকল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মূলিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভ মধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারি দিক্ চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোন দিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী, মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোন দিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা

যায় না—পথ দেখা যায় না—শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদী-প্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল--নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহা ভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তর মধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকৃত পুরুষ, বিনাবাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আবার সেই! এই দীর্ঘাকৃত পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৃত্যগীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকা মধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মাহতাবচন্দ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্ম্মরবিন্যাসশীতল মণ্ডপমধ্যে, নর্ত্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালারশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে—আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে, —আর নর্ত্তকীর প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিতেছিল! যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি, বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কল কণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে, ডায়মনকাটা মল-ঝাজু লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে, গগনমণ্ডলে, সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া, তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্র-কিরণ-প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু-প্রপীড়নে

সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন স্পার্ক্লিংশ্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিক পাত্রে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন সন্দেশময় ফলাহারের পাতে, রজতমুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুর্‌গণ খাঁ।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান সৈন্য প্রেরিত হইয়া, পাটনাস্থিত মুসলমান সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া, পাটনা পুনর্ব্বার মীরকাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গণ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য গীত উপলক্ষ মাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গণ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না। সকলে যাহা করে, তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়?

গুর্‌গণ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ-সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুর্‌গণ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিকে, কাসেম আলি খাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কেন না, তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশতঃ তাহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীরকাসেমের

প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই ; কিন্তু এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুর্‌গণ খাঁ দেখাসাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎশেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুর্‌গণ এবং অন্যান্য রাজামাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন্।

গুর্‌গণ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক্ বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র—অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবার্ত্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুরগণ খাঁ বলিতেছেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব—আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন ?"

মাহতাবচন্দ। কি মতলব ?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্‌গণ খাঁ বলিলেন, "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

সেই সময়ে মনিয়া বাই নিকটে আসিয়া সনদী খেয়াল গাইল—"শিখে হো ছল ভালা" ইত্যাদি। শুনিয়া মাহতাব হাসিয়া বলিলেন, "কাকে বলে ? যাক্—আমরা রাজি আছি—আমাদের মূলধন সুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল্—কোন দায়ে না ঠেকি।"

এইরূপে এক দিকে, বাইজি কেদার, হাম্বির, ছায়ানট ইত্যাদি রাগ ঝাড়িতে লাগিল, আর এক দিকে, গুর্‌গণ খাঁ ও জগৎশেঠ রূপেয়া, নোক্‌সান, দর্শনী প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুর্‌গণ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক্ কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন ?"

মাহ। না—দেশী না বিলাতী ?

গুর। দেশী।

মাহ। কোথায় ?

গুর্। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে।

মাহ। ধনী কেমন ?

গুর্। এখনও বড় ভারী ধনী নয়—কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

মাহ। কার সঙ্গে তাহার লেনদেন ?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠির সঙ্গে।

মাহ। হিন্দু না মুসলমান ?

গুর্। হিন্দু।

মাহ। নাম কি ?

গুর্। প্রতাপ রায়।

মাহ। বাড়ী কোথায় ?

গুর্। মুরশিদাবাদের নিকট।

মাহ। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গুর্। অতি ভয়ানক লোক।

মাহ। কেন সে হঠাৎ এ প্রকার করিতেছে ?

গুর্। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মাহ। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ ?

গুর্। কেন সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ ? জমীজমা তালুক মুলুকও দিতে পারি। কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে ?

মাহ। আর কি থাকিতে পারে ? কিসে প্রতাপ রায় এত মাতিল ?

বাইজি সে সময়ে গায়িতেছিল, "গোরে গোরে মুখ পরা বেশর শোহে।"

মাহতাবচন্দ বলিলেন, "তাই কি ? কার গোরা মুখ ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দলনী কি করিল

মহাকায় পুরুষ নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল।

দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন। সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোকপরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মসনদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীরকাসেম এ প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীরকাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া তকি এই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথা সম্মানপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী খানসামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, বেগম আমিয়টের উপপত্নী স্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এসকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্‌গণের নিকট বাস করিব। যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে আমি পলাইয়া যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব।" এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

কেহ কেহ বলে, দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মুরশিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত, দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে হউক, অমঙ্গলসূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিল, "তোমায় চিনি। তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল, "জানি, তুমি এই বিজন স্থানে দুরাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।"

দলনীর চক্ষের-প্রবাহ আবার ছুটিল। আগন্তুক কহিল, "এক্ষণে তুমি কোথা যাইবে ?"

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল। ভয় বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল। দলনী কাঁদিল। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন পুনরুক্ত করিলেন। দলনী বলিল, "যাইব কোথায় ? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর। কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবে ?"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।"

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিল, বলিল, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।"

"তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।"

"আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।"

"তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।"

দলনী চিন্তিত হইল। বলিল, "ভবিতব্য কে জানে ? চলুন, আপনার সঙ্গে আমি মুরশিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুই জনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল। দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড

সিদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা

পূর্ব্বকথা যাহা বলি নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্রশেখরই যে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে।

যে দিন আমিয়ট, ফষ্টরের সহিত, মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দ স্বামী জানিলেন যে, ফষ্টর ও দলনীবেগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে গিয়া চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে এ সম্বাদ অবগত করাইলেন, বলিলেন, "এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার কার্য্য কর। এই যবনকন্যা ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাহাদের অনুসরণ কর।" চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সম্বাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দ স্বামী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আমি সেখানে সম্বাদ দেওয়াইব।" চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে, অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামীও সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী পাঠাইবার উদ্যোগে উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে, শৈবলিনী পৃথক্ নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দ স্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, ফষ্টরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দ স্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, "বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।" এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দ স্বামী, চিরকাল পদব্রজে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তিনি তটপথে, পদব্রজে, শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া আসিলেন; বিশেষ তিনি আহার

নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তীরে রমানন্দ স্বামীকে দেখিয়া, তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "একবার, নবদ্বীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব, অভিলাষ করিয়াছি ; চল তোমার সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহারা ক্ষুদ্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীরে উঠিলেন। দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভৃতে রহিল ; তাঁহারা দুই জনে তীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিনী সাঁতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন, তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাহারা নৌকা লাগাইল, দেখিয়া তাঁহারাও কিছু দূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দ স্বামী অনন্তবুদ্ধিশালী,—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে ?"

চ। না।

র। তবে, অদ্য রাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেল। ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। প্রভাত হয়, তথাপি ফিরিল না। তখন রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে। চল, উহার অনুসরণ করি।"

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তোমার বাহুতে বল কত ?"

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "উত্তম। শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে। আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও।"

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে ?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?" এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্ত্তব্য সাধিত হইলে তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।"

এই কথার পর চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রমানন্দ স্বামী তাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে?"

রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই এক দিন বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও। যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

গুরুর আদেশ মত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ

পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাস বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব! আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি বলিলেন, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?"

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাট-গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে চিন্তা-গুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে?" মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যথার্থ বটে। জাল নহে। "কই বিষ?"

"কই বিষ ?" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন ?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে ?

মহ। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ ?

মহ। আপনি বিষপান করিবেন না কি ?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না ?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা—সবে মাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ-নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব ? সয়তান আসিয়া তকির কাণে কাণে বলিল,—"হৃদয় মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী— লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"ও রাজরাজেশ্বর! শাহানশাহা। বাদশাহের বাদশাহ! এ গরিব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব ? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষ পান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর—কোথায় রহিলে ? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।"

করিমন নামে এক জন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমত ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে তুমি লইও।"

করিমন, দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ দিল,—"করিমন বাঁদি আজ এই মাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমনকে ধরিলেন। করিমন স্বীকার করিল। বলিল, "বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।"

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, দলনী আসনে ঊর্দ্ধমুখে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছে—বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে ?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও বরাট

মীরকাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হটিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া

উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতি রোধ করিতেছিলেন।

মীরকাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমির হোসেন, একদা জানাইল যে, এক জন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে—হজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "এক জন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন্ হষ্টিং সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারন্ হেষ্টিংস্ লিখিয়াছিলেন, এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া, স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম্।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস বাঁদী—মরিবি—?"

কুল্‌সম্ নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর হোসেন কুল্‌সমের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীরকাসেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেইখানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্‌সম্ বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?"

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারি দিক্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য,

রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল—এক জন কুল্‌সমের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন।"

"শুনুন, সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীরকাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গণ খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া কেহ আর কুল্‌সমের উপর আক্রমণ করিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "গুর্‌গণ খাঁ ও দৌলত উন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীরকাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম্ তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা দুই জনে গুর্‌গণ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্ত্তন, আর নিষেধ, ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনীভ্রমে দলনীরে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল, "আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক। মনে করিয়াছিলাম, নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে নাই। শুনিলাম হেষ্টিং সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।"

এই বলিয়া কুল্‌সম্ কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শত শত রশ্মি-প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব,

—অধোবদনে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও ত রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল। তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম্‌ সত্যই বলিয়াছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ!

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীরকাসেম বলিতে লাগিলেন, "শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজে বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—

আলি ইব্রাহিম খাঁ?"

ইব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

ইব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "আর কেহ আমার উপকার করিবে?"

সকলেই যোড়হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, "কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনী কে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্‌ফান যুক্ত করে নিবেদন করিল, "অবশ্য এত দিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া মহম্মদ ইর্‌ফান বিদায় হইল।

তাহার পরে নবাব বলিলেন, "যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পার?"

মহম্মদ ইর্‌ফান বলিল, "হুকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।"

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, "গুরগণ খাঁ কত দূর?"

অমাত্যবর্গ বলিলেন, "তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই।" নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "ফৌজ! ফৌজ! কাহার ফৌজ!" এক জন কে চুপি চুপি বলিলেন, "তাঁরি!"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে নবাবি এইরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্ ষ্টালকার্ট

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্যরক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তখন তিনি গবর্ণর হন নাই। কুল্‌সম্‌কে বিদায় করিয়া তিনি ফষ্টরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল।

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফষ্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন ; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফষ্টরও নিজকার্য্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয়, অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে পূর্ব্বপ্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে এক জন সুইস্ বা জর্ম্মান মীরকাসেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়নালায় যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর আপন নাম গোপন করিয়া, জন্ ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুল্‌সমকে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, এক জন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন্ ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যালকার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যালকার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লরেন্স ফষ্টর নামক এক জন ইংরেজকে আপনি চিনেন ?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফষ্টর ? কই—না।"

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন তাহার নাম শুনিয়াছেন ?"

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল, "নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই ? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যাল্‌কার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই এক বার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফষ্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমীর হোসেন জানিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়মবহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফষ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরস্থ কেশশূন্য আঘাত-চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যাল্‌কার্ট কি আঘাত-চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল !

আমীর হোসেন বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন; তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্‌সম্ তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্‌সম্ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার এক জন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম্ আসিল। ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুল্‌সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ ?"

কুল্‌সম্ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি ?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব ! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি ?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবার বেদগ্রামে

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কবাট সকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে। কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐখানে দাঁড়াইয়া, পুস্তকরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী।"

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্ব্বস্বপ্নদৃষ্ট করবীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিত-লোচনে চারি দিক্ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ, বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরেজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া

শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিনতে পারিস্?"

শৈবলিনী বলিল, "পারি—তুই পার্ব্বতী।"

সুন্দরী বলিল, "মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, "ভুলব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া কল্লুম। পার্ব্বতী দিদি একটি গীত গা না?

আমার মরম কথা তাই লো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাই নে পার্ব্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।"

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর এক দিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন; পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যক সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহারে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদ সহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে, চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ প্রয়োগের শুভ লগ্ন অবধারিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগবল না PSYCHIC FORCE ?

ঔষধ কি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন-ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয় দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়া-ছিলেন—পারমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন্ চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য, শয্যা রচনা করিতে বলিলেন; সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবা-মাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপাত্র মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডূষ গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত

জলমাত্র।" চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইহাতে কি হইবে?" স্বামী বলিয়াছিলেন, "কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু, প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী, নিদ্রাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে?

শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান?

শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে কে আছে?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

চ। তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

চ। এ সকল কথা এত দিন তোমার মনে পড়ে নাই কেন?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্য সত্য, না কাপট্য আছে?

শৈ। সত্য সত্য কাপট্য নাই।

চ। তবে এখন?

শৈ। এখন এ যে স্বপ্ন—আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

চ। তবে সত্য কথা বলিবে?

শৈ। বলিব।

চ। তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্রচক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার?"

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সে দিনে, গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে?"

শৈ। পড়ে।

চ। কি কি কথা হইয়াছিল?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?"

শৈ। বাসমাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাস মাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি—মহাপাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চ। ফষ্টর সম্বন্ধে?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "সত্যই বলিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া জাতিভ্রষ্টা হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন আমি জাতিভ্রষ্টা কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু

পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন ;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।" ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন ?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?

চ। এ সকল কথা কে জানে ?

শৈ। ফষ্টর আর পার্ব্বতী।

চ। পার্ব্বতী কোথায় ?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায় ?

শৈ। উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার ?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতোছ—আপনার শ্রীচরণ কৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্ছা কর ?

শৈ। যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন ?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায় ?

চ। কেন, আমার গৃহে ?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন ?

চ। যদি করি ?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই—রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,—বল ও কিসের শব্দ ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে ?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান্—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্ব্বে?

শৈ। না। দুই জনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন যে, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আগামী কল্য আমাদের দুই জনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছিলেন—শেষ রাজা, কেন না, মীরকাসেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বার দিয়া, মুক্তাপ্রবালরজতকাঞ্চনশোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ, মুক্তাহীরামণ্ডিত হইয়া শিরোদেশে উষ্ণীষোপরে উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ডরঞ্জিত করিয়া দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দিগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইরফান বলিলেন, “সকলেই উপস্থিত।” নবাব, প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?”

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই। এত কালের পর ভাবিলেন, “এত কাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।”

“আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।”

নবাব। তুমি কোন্ জাতি?

ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সে জন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, “জানিলাম তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে?”

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইরফান চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, “ইহাকে চেন?”

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল। বাঁদী কুল্‌সম্ কোথায়?

কুল্‌সম্‌ও আসিল।

নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, “এই বাঁদীকে চেন?”

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইরফান, তকি খাঁকে বন্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এত দিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন্ পক্ষে যাই; এই জন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি হিব্রাহিম্ খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম্! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে।"

কুল্‌সম্, আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা! আমি এই আম-দরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।"

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?"

কুল্‌সম্, বিস্ফারিতলোচনে, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই। যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর।"

ন। কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার এক জন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।"

কুল্‌সম্ তখন চিনিল। বলিল, "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, "রাজন্, যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা কথা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখর নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—"

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল, "আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি। ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী,—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন।—আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল—বলিল, "আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিম্বদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে—কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কখন তোমাকে ডাকি নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই, চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ, তাহা কখন মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর।"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজুট-ধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ, দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই জটাজুটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে, "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার ?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনী প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল, "না।"

সকলেই শুনিল, "না। আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি চন্দ্রশেখর, কি কে করিল, ফষ্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল যে, "তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন ?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে ; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই। কখন তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে ?"

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই। সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন। কি রাঁধিত ?

ফষ্টর। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না।

প্রশ্ন। জল ?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

এমত সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধুরূম্ ধুরূম্ ধুম্ বুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও?"

ইরফান কাতর স্বরে, বলিল, "আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। "দুড়ুম্ দুড়ুম্ দুম্" আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীম নাদ লক্ষে লক্ষে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারি দিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইলে—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভৃত্যগণ, ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্সম্, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্রে

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! অতঃপর কি করিবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারি দিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে। চারি দিক্ ধূমে অন্ধকার—কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই,—দেখিতেছ না, কোন্ দিকে যবনসেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্—বলবান্—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয় ইহারা এক দিন

সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল আমরা পলায়নপরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই। তোমার আমার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।"

তিন জনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদ্গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে এক দল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতরন্ধ্র-পথে নির্গত হইয়া ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে বিমনা হইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া প্রতাপ, তিন জনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি পর্ব্বতমালামধ্যস্থ নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে, সমর-ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে বলিলেন, "প্রতাপ, তুমি ধন্য; তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, "আমার একটা কথা কাণে কাণে শুনিবে; আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী, তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে

বলিলেন, "চুপ। এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব—কিন্তু তোমার অনুমতিসাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাত পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাও?"

প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না। যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্‌গা ধরিলেন। বলিলেন, "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্‌ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?"

প্রতাপ, মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া, রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।" রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপাকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ "জল! জল!" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে, আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধৃবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে, রক্তপ্লাবিত হইয়া পলাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া এক জন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা?" সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দ স্বামী গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই, কয়েক জন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্রে স্তূপাকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ! আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য, হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর।"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।"

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিল, "আপনি, কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?"

স্বামী বলিলেন, "যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। এবং বোধ হয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল— বলিল, "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আমি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম— জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই

অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।

পৃ. ১১, পংক্তি ২৪, "সূত্রবিশেষের" স্থলে "শাঙ্করভাষ্যের" ছিল।

পৃ. ১২, পংক্তি ২৩, "ঈষদ্ভিন্ন করিয়া" স্থলে "ঈষদ্ভিন্ন হইয়া" ছিল।

পৃ. ১৩, পংক্তি ১২-১৪ "পরদিন প্রাতে…কাজ আছে।" অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ১৪, পংক্তি ২৬, "স্বেচ্ছাচারী" কথাটি স্থলে "পাপিষ্ঠ" ছিল।

পৃ. ১৭, পংক্তি ৬, "ক্রমে দেখিবে," স্থলে "ক্রমে দেখিলে" ছিল।

পৃ. ২০, পংক্তি ১৫, "পুতুলকে" স্থলে "পুত্তলকে" ছিল।

২৮, "নিশ্চয়" স্থলে "নিশ্চিত" ছিল।

পৃ. ২১, পংক্তি ২৪, "এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম।" কথাগুলির স্থলে ছিল—

লোকে বলে, সকলই মায়া! কিন্তু মায়া নহে, তাহারাই মায়ার মায়ায় মুগ্ধ। ভগবান্ বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি।

পৃ. ২৪, পংক্তি ২, "পাপ" কথাটি ছিল না।

পৃ. ২৫, পংক্তি ৬, "তোকে আমাকে" কথা দুইটির পর "এক" ছিল।

২৪, "এ কাজ বড় শক্ত।" কথাগুলির স্থলে ছিল—

এ কাজ আমা হইতে হইবে না।

পৃ. ২৫, পংক্তি ২৪-২৫ "উভয়ে মরিব। যা হোক, তোমার কর্ম

স্থলে ছিল—

উভয়ে মরিব।

দ। এই বুঝি বড়াই? ভাল আমিই পথ বলিয়া দিই। নবাবকে ব

না, কেন না তাহা হইলে আমারই মাথা যাইবে। তুমিও বোধ হয় ঐ কারণে

তোমার উপর না থাকিলে তোমার সাক্ষাৎ এ কথা আদৌ উত্থাপিত করিতা

বিশ্বাসী খোজা কেহ কি নাই?

কু। আছে। খোজাকে ভয় করি না, কিন্তু গুরগণ খাঁ?

দ। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি না জানিয়া সাহস করিব কেন?

কু। তোমার কর্ম তুমি

পৃ. ২৫, পংক্তি ২৭-২৮ "এই পত্রকে সূত্রে…একত্র গাঁথিলেন।" ক

পৃ. ২৬, পংক্তি ৩, "যাহার কাছে…গুরগণ খাঁ।" কথা কয়টি ছিল